উপনিবেশবাদ ও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

মাসুদুজ্জামান*

নানা সৃজনী রচনার মতো রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। আশি বছরের জীবন–পরিসরে বিভিন্ন পর্বে তিনি যে একাত্তরটি গল্প লিখেছিলেন তার অনেকগুলি – যেমন 'পোস্টমাস্টার' (১২৯৮), 'একরাত্রি' (১৩৯৯), 'শাস্তি' (১২৯৯), 'মেঘ ও রৌদ্র' (১৩০১), 'দিদি' (১৩০১), 'দুর্বুদ্ধি' (১৩০৭), 'পাত্র–পাত্রী' (১৩২৪), 'নষ্টনীড়' (১৩০৯), 'রাজটিকা' (১৩০৫), 'স্ত্রীর পত্র' (১৩২১), 'বদনাম' (১৯৪১), 'শেষ কথা' (১৩৪৬) ইত্যাদি এই ভাবনার দ্বারা স্পৃষ্ট। এসব গল্পে ঔপনিবেশিক 'সাংস্কৃতিক আধিপত্য' (সাঈদ ১৯৭৮) যেমন উপজীব্য হয়েছে, তেমনি 'সাংস্কৃতিক প্রতিরোধকে'ও (সাঈদ ১৯৯৩) তিনি বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। এই আধিপত্যবাদ এবং প্রতিরোধের সঙ্গে যে 'ক্ষমতা'র প্রসঙ্গটি জড়িত, আন্তোনিও গ্রামশি আমাদের প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন ; পরবর্তীকালে ফুকোর লেখায় পাই এই ভাবনার আরও বিস্তার। রবীন্দ্রনাথ এই আধুনিক অর্থেই ক্ষমতায়ন বা আধিপত্যকে তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন।

২

আন্তোনিও গ্রামশি বলেছিলেন, ক্ষমতার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। শাসকগোষ্ঠী জনসাধারণের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে দু'ভাবে – 'আধিপত্য' স্থাপন এবং 'বৌদ্ধিক (intelectual) ও নৈতিক নেতৃত্বে'র মাধ্যমে। শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জয়ী হতে হলে আবার ঐ বৌদ্ধিক–নৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেই জয়ী হতে হবে (গ্রামশি ১৯৭১ : ৫৭)। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শক্তি ভারতে এভাবেই আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং ভারতবর্ষ শাসন করেছে। আধিপত্যের এই চেহারা রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল খুব স্পষ্ট। উপনিবেশের অধীনে থেকেও তাই তিনি আধিপত্যবাদী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে–গ্রামশি যেমন বলেছেন – 'বৌদ্ধিক ও নৈতিক' ডিসকোর্স

---

* সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গড়ে তুলেছেন। পরবর্তীকালে পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রামশির ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করে ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের তিনটি স্তর রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন : সূচনা পর্ব (moment of departure), কৌশলী পর্ব (moment of manoeuvre) এবং অর্জনের পর্ব (moment of arival) (পার্থ ১৯৮৬)। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে তিনি এই তিনটি স্তর অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে উপনিবেশ-বিরোধী নৈতিক-বৌদ্ধিক অবস্থানকে সুসংহত করেছেন। (মাসুদুজ্জামান ১৯৯৭ : ৮৪)। গড়ে তুলেছেন প্রাচ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ-বিরোধী নিজস্ব ডিসকোর্স।

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে। ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে ঔপনিবেশিক বিশ্বব্যবস্থার অধীনে ছিলেন তিনি। বাণিজ্যপুঁজির মধ্য দিয়ে এখন থেকে প্রায় পাঁচশো' বছর আগে ইউরোপীয়রা পৃথিবী জুড়ে উপনিবেশবাদের উত্থান ঘটায়। ধীরে ধীরে তারা বিশ্ববাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি নিজেদের কব্জায় এনে সারা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করে। পৃথিবীর মানুষ এই সময়েই একদিকে লক্ষ করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির মহাউত্থান, সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ; অন্যদিকে 'নেটিভ' বা উপনিবেশের অধীন দেশগুলির সাধারণ মানুষের উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রাম। শেষের এই প্রতিবাদী বা প্রতিরোধী সাহিত্যের ধারা থেকেই 'পোস্টকলোনিয়াল' বা 'উপনিবেশ-উত্তর' সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটেছে (বোহেমার ১৯৯৫ : ১)।

বোহেমার বলেছেন, উপনিবেশকে কেন্দ্র করে দুই বিপরীত ধারার লেখকের আবির্ভাব ঘটে। এক ধরনের লেখক ছিলেন উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশের (মেট্রোপলিটনের) মানুষ – ঔপনিবেশিক সমস্ত কর্মকাণ্ডকে যারা ঢালাওভাবে সমর্থন করেছেন, নৈতিক-বৌদ্ধিক সমর্থন যুগিয়েছেন ; আর এক ধরনের লেখক ছিলেন উপনিবেশের অধীন দেশগুলির মানুষ (উপনিবেশ স্থাপনকারীদের চোখে 'নেটিভ' বা 'আদার'), যারা ঔপনিবেশিক শক্তির বিরোধিতা করেছেন, তাদের উপস্থিতির যৌক্তিকতা নিয়ে নৈতিক-বৌদ্ধিক প্রশ্ন তুলেছেন, প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। প্রথম শ্রেণীর লেখকদের লক্ষ্য ছিল যে-করেই হোক ক্ষমতাকে ধরে রাখা ; আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকেরা চেয়েছেন তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে, আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে (বোহেমার (১৯৯৫)। দুই শ্রেণীর লেখকই এসব করেছেন লেখা বা 'রচনা'র (টেক্সটের) মাধ্যমে। এডোয়ার্ড সাঈদ প্রথম শ্রেণীর লেখকদের মতাদর্শকে 'প্রাচ্যবাদ' (ওরিয়েন্টালিজম) এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের মনোভাবকে 'সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ'

বলে উল্লেখ করেছেন (সাঈদ ১৯৭৮, ১৯৯৩)। ফুকো অবশ্য সাঈদেরও আগে উল্লেখ করেছিলেন যে, ক্ষমতা জ্ঞান উৎপাদন করে, ক্ষমতা এবং জ্ঞান পরস্পরসাপেক্ষ। ক্ষমতা টেক্সট তৈরির মধ্য দিয়ে জ্ঞান উৎপাদন করে। ক্ষমতাকে আরও নিরঙ্কুশ করার জন্যে এই টেক্সটই আধিপত্যবাদী মতাদর্শ চাপিয়ে দেয় (ফুকো ১৯৯১ : ২৭)। এই প্রেক্ষাপটে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, উপনিবেশবাদীরা এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ সামরিক শক্তিবলে নিজেদের দখলে রেখে তাদের আধিপত্যবাদী বা প্রাধান্যবাদী মতাদর্শ উপনিবেশের অধীন দেশগুলির ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু উপনিবেশের নেটিভরা যখন মতাদর্শিকভাবে প্রতিরোধের যোগ্য হয়ে উঠলো তখনই শুরু হলো সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ। ভারতেও দেখা গেল এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে। ইংরেজদের শিক্ষানীতি শুধু একঝাঁক কেরানি তৈরি করা নয়, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-ভূদেব-রবীন্দ্রনাথের মতো বুদ্ধিজীবীরও জন্ম দিল। তাঁরাই কমবেশি ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের মতাদর্শের ওপর নিজেদের মতাদর্শকে স্থাপন করে প্রাধান্য বিস্তার করলেন। কোনো সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই মতাদর্শ স্থাপনকারীদের একেবারে শীর্ষে। তিনি উপনিবেশের অধীন লেখক হিসেবে জন্ম নিলেও (ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত সক্রিয় সব লেখকই জন্মসূত্রে এই ধারার লেখক) তাঁর হাতেই বাংলা উপনিবেশ-উত্তর সাহিত্যেরও সূচনা ঘটে, যদিও তাঁর জীবদ্দশায় রাজনৈতিকভাবে ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশের একটি উপনিবেশ।

৩

সমালোচনা-সাহিত্যে উপনিবেশবাদী এবং উপনিবেশ-উত্তর সাহিত্যতত্ত্ব চলতি শতাব্দীর নব্বুইয়ের দশকে একটি বিশিষ্ট সাহিত্যতত্ত্ব হিসেবে প্রাধান্য বিস্তার করে (ব্যারি ১৯৯৫ : ১৯১)। পঞ্চাশের দশকে ফ্রাঞ্জ ফানোঁ তাঁর রেচেড অফ দি আর্থ গ্রন্থে প্রথম ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেন। পরে এডোওয়ার্ড সাঈদের ওরিয়েন্টালিজ এবং কালচার অ্যাণ্ড ইমপেরিয়ালিজ গ্রন্থে এর ইঙ্গিতগর্ভ উল্লেখ পাই। এছাড়া হোমি ভাবা, জান মোহাম্মদ, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, বিল অ্যাশক্রফ্ট, এলেকে বোহেমার, পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রাবন্ধিক-ঐতিহাসিক গত দশকে একে দিয়েছেন মতাদর্শিক-তাত্ত্বিক ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই সৃষ্টি হয়েছে উপনিবেশ-উত্তর সাহিত্যতত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে লেখকেরা উপনিবেশের অভিজ্ঞতা বা অনুষঙ্গকে কিভাবে তাঁদের লেখায় তুলে আনছেন তা লক্ষ করা হয়।

ঔপনিবেশিক শাসনের বিস্তার, আধিপত্যের স্বরূপ, ক্ষমতায়নের রূপ-বৈচিত্র্য, এর বিরোধিতা এই সাহিত্যে কিভাবে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তারও বিশ্লেষণ থাকে।

উপনিবেশ-উত্তর সাহিত্যের ধারায়, আগেই বলেছি, দু'ধরনের লেখককে পাওয়া যায় – একধরনের লেখক ছিলেন উপনিবেশবাদের সমর্থক, যারা মেট্রোপলিটন বা উপনিবেশবাদী দেশের মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই তারা উপনিবেশকে টিকিয়ে রাখার জন্যে কাজ করেছেন। উপনিবেশ স্থাপনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

> 'পশ্চিম' বলতে ধারণা দেওয়া হয়েছে শাদা চামড়ার খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী, যুক্তিবাদী, সভ্য, আধুনিক, যৌনক্রিয়াকাণ্ডে সুশৃঙ্খল এবং অবশ্যই 'পুরুষালি' মানুষ হিসেবে ; অন্যদিকে উপনিবেশের অধীন 'অন্যদেরকে' বাখ্যা করা হয়েছে 'নেটিভ' হিসেবে, যারা কালো, আদিম, যুক্তিহীন, অসভ্য, প্রাগাধুনিক, যৌনতাড়িত, নিয়ম ভঙ্গকারী, পৌরুষহীন, দুর্বল, শিশুসুলভ। এর মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে যে ইউরোপীয়রা অ-ইউরোপীয়দের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তারা শুধু প্রাচ্যকে শাসন করবার জন্যে যোগ্য নয়, তাদের দায়িত্বই হচ্ছে প্রাচ্যকে শাসন করা এবং 'সভ্য' করা। (রাত্তানসি ১৯৯৭ : ৪৮০)

সাঈদের মতে পশ্চিমের লেখকেরা এভাবেই তাদের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত রাখার জন্যে 'নেটিভ', 'আদার', 'বর্বর', ইত্যাদি ধারণা (কনসেপ্ট) সৃষ্টি করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্বের মিথ তৈরি করেছে। তারা নেটিভদের জন্যে একধরণের নিয়ম-কানুন বা আচরণের সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে (সাঈদ ১৯৭৮ : ২২৭)।

অন্যদিকে উপনিবেশের অধীন লেখকেরা প্রভুত্বকামী এই ধারণাগুলোরই বিরোধিতা করেছেন, যা ঘটেছে ধীরে ধীরে। তাঁরা প্রথমে উপনিবেশবাদী চিন্তা বা ডিসকোর্সেরই বলয়ে ছিলেন, তাদের সঙ্গে সহযোগিতাও করেছেন ; পরে গড়ে তুলেছেন প্রতিরোধ। ফ্রাঞ্জ ফাঁনো দেখিয়েছেন উপনিবেশবাদী শাসকদের সঙ্গে এই সহযোগিতা করা হয়েছে আয়, প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতাকে ভাগাভাগি করে ভোগ করার জন্যে (বোহেমার ১৯৯৫ : ১১৬)। কিন্তু পরে যখন জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হলো তখন দেখা দিলো বিরোধ, প্রতিরোধ। উপনিবেশের অধীন লেখকদের এভাবেই পরস্পর-বিরোধী দুই রাজনৈতিক-মতাদর্শিক ধারার মধ্যে স্থাপিত থাকতে হয়েছে – অর্থাৎ তাঁরা আসলে কোনো ধারারই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তবে স্বার্থের সংঘাত বাধলে প্রান্তিক অবস্থান থেকে তারা নিজেদের আত্মপুনর্গঠনে নিযুক্ত হন। জাতীয় বীরদের খুঁজে

বের করে স্বদেশের গৌরবগাঁথা রচনা করেন। ঐতিহ্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হন, অতীতের দিকে তাঁদের দৃষ্টি পড়ে। গ্রামীণ-প্রাকৃতিক পরিবেশকে শান্ত-সুন্দর করে তুলে ধরে স্বদেশ-চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে দেশের মানুষকে স্বাধীনতাবোধে উজ্জীবিত করে তোলেন ; আর এসব করা হয় সমন্বিতভাবে। বেনেডিক্ট অ্যাণ্ডারসন এই প্রক্রিয়াকেই 'কল্পিত রাষ্ট্রচিন্তা' বলে উল্লেখ করেছেন, বাস্তবে না থাকলেও লেখকদের কল্পনায় যা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। সাঈদের ভাষায় একে 'মতাদর্শিক বা 'সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ' বলে উল্লেখ করা যায়। পশ্চিমী সাহিত্যরীতি – উপন্যাস ও ছোটগল্পকে এই একই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নিজেদের বলে গ্রহণ করে তার মধ্যে তাঁরা 'সাংস্কৃতিক স্থান' (কালচারাল স্পেস) তৈরি করে নিয়েছেন এবং নিজেদের 'অভিজ্ঞতা'কে উপজীব্য করেছেন। ফলে ঘটলো উপনিবেশবাদী ধারণাগুলোর পুনর্গঠন ও প্রতিরোধ। এই পুনর্গঠন ও প্রতিরোধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন দেরিদা ও ফুকো। ফুকোকেই প্রথম আধিপত্য (বা ক্ষমতা) বিস্তারে টেক্সট্ যে কত বড়ো ভূমিকা রাখে তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। দেরিদা বলেছেন আপাত অর্থে একটি টেক্সট্ যা বলে তা-ই সব নয়, টেক্সটের মধ্যে না-বলা কথাও অনেক থাকে, পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে যা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যায়, বুঝে নিতে হয় (ডেভিড ট্রটার ১৯৮৬ : ৬)।

রবীন্দ্রনাথও প্রতিরোধের উল্লিখিত ধারায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির মুখোমুখি হয়েছেন, তার বিরুদ্ধে নিজস্ব ডিসকোর্স গড়ে তুলেছেন। তাঁর বেশকিছু ছোটগল্প আমরা এই পরিবেশ-প্রতিরোধের নানামাত্রিক ছবি পাই, যা তৎকালীন ঔপনিবেশিক পরিবেশ, আধিপত্য, ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের রূপটিকে আমাদের কাছে বেশ স্পষ্ট করে তোলে। ভারতীয় ও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বা তাদের সৃষ্ট স্থানীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে কী রকম মিথস্ক্রিয়া ঘটেছিল, কী রকম সংঘাত-সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়েছিল, ব্যক্তি-মানুষের রূপ কেমন দাঁড়িয়েছিল – তার ছবিও এসব গল্পে উপজীব্য হয়েছে।

৪

রবীন্দ্রনাথ শুরু থেকেই ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত ভারতবর্ষের হতদরিদ্র রূপ সম্পর্কে যে সচেতন ছিলেন, 'পোস্টমাস্টা'র গল্পে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই গল্পে পোস্টমাস্টারের যে চরিত্রটি পাই, "এদেশে সদ্য-আগত ইউরোপীয় সভ্যতার অসম-রশ্মিপাতে" (আনোয়ার ১৩৭০ : ১২) তৈরি উপনিবেশের অধীন কলকাতা নগরে তার জন্ম। মেকলের শিক্ষাদর্শে সৃষ্ট এই 'বাবু'দের গ্রামের নিম্নবর্গের মানুষের

সঙ্গে কোনো যোগ ছিল না, থাকার কথাও নয়। ফলে স্থানীয় লোকের সঙ্গে তার মেলামেশা হয়ে ওঠেনি। রতনের সেবা পেলেও রতনকে সে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি। বরং রতনকে ছেড়ে আসার মুহূর্তে যখন তার মনে 'বেদনা' জাগে, তখন সে ঔপনিবেশিক শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথাকথিত 'তত্ত্বের দ্বারা সেই বেদনাকে লঘু করে নিয়েছে। রতন কিন্তু এই তত্ত্ব নয়, মানবিক সম্পর্কের টানে "সেই পোষ্টআপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।"

আসলে ঔপনিবেশিক শাসকরা বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ভারতকে ভূসংস্থানের দিক থেকে নগর ও গ্রামে বিভক্ত করে ফেলার কারণে ভারতীয় জনগোষ্ঠী পারস্পরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বর্ণপ্রথার দ্বারা বিভক্ত চতুবর্ণের মানুষ দুটি বর্গে বিভক্ত হয়ে যায় – এর একদিকে পাই ঔপনিবেশিক প্রয়োজনে তৈরি পাশ্চাত্য শিক্ষাপুষ্ট মধ্যবিত্ত নাগরিক শ্রেণী, অন্যদিকে গ্রামীণ নিম্নবর্গের অশিক্ষিতজন। এই দুই শ্রেণীর মানুষদের কেউ-ই সেইভাবে বিকশিত হতে পারেনি। গ্রামীণ মানুষ যেমন দরিদ্র থেকে গেছে, তেমনি নগরের শিক্ষিত ভারতীয়রাও পোস্টমাস্টারের মতো 'অতি সামান্য' বেতনে ঔপনিবেশিক শাসকদের চাকরি করতে বাধ্য হয়েছে।

'পোস্টমাস্টার' গল্পেই রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক শোষণে আক্রান্ত গ্রামের চেহারাও তুলে ধরেছেন : "একখানি অন্ধকার আটাচালার মধ্যে তাঁহার আপিস ; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল।" বর্ষণ হলে "গ্রামের রাস্তায় চলাচল একপ্রকার বন্ধ – নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।"

ঔপনিবেশিক কালের তৈরি অবহেলিত দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশের গ্রামের আরও বর্ণনা পাই 'স্ত্রীর পত্র' ও 'শাস্তি' গল্পে :

> ক. বাংলা দেশে পিলে যকৃৎ অম্লশূল এবং কনের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না – তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না। ('স্ত্রীর পত্র', রবীন্দ্রনাথ : ১৩৯৭খ : ৩২৯ ৩৩০)
>
> খ. বর্ষায় ঘরের চারি দিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের খেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ('শাস্তি', রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৬ : ৩৭৭)

'শাস্তি' গল্পটি শুধু এই কারণে নয়, 'নিম্নবর্গীয় সচেতনতার' (subaltern

consciousness) জন্যে উল্লেখযোগ্য। এই একটি মাত্র গল্পে নিম্নবর্গের নারী চন্দরা ঔপনিবেশিক কালের বিচার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়েছে। ঔপনিবেশিক সমাজে উচ্চবর্গের শোষণে নিম্নবর্গের মানুষকে যে কী সকরুণ অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়তে হতো, এই গল্পে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

'শাস্তি' ও 'পোস্টমাস্টার' গল্পের শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা নিম্নবর্গীয় মানুষদের মতো 'একরাত্রি' গল্পের নায়কের আকাঙ্ক্ষাও বেশিদূর বিস্তৃত হতে পারেনি। "কালেক্টরের নাজির না হইতে পারি তো জজ-আদালতের হেডক্লার্ক হইব"- এই ছিল ঐ গল্পের নায়কের ইচ্ছে। ঔপনিবেশিক শাসনকে প্রতিরোধের দ্বারা উদ্দীপিত তরুণরা কী করবে স্থির করতে পারছিল না। প্রতিরোধের রাজনীতিও তখন অন্তঃসারশূন্যতায় আক্রান্ত। কিন্তু ততদিনে ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার নিষ্ঠুর দিকটি ক্রমেই তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল : "ইহারা আমাদের বাংলাদেশে পূজ্য দেবতা ; তেত্রিশ কোটির ছোটো ছোটো নূতন সংস্করণ।"

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের অত্যাচারের মাত্রা যে কতটা সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছিল তার পরিচয় পাচ্ছি 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে। "গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষুর চাষ, মিথ্যা মকদ্দমা এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্যচর্চা করিত কেবল শশিভূষণ এবং গিরিবালা।" এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই গ্রামীণ সমাজকাঠামো যে ইতোমধ্যে বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে তার উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শশিভূষণের মতো বুর্জোয়া মানবতাবাদী, সুকুমার মনের চরিত্রসমূহ যে সৃষ্টি হচ্ছে, তারও ইঙ্গিত পাই আমরা।

মানবতাবাদী শশিভূষণের সঙ্গে ক্ষমতা মদমত্ত ইংরেজদের সংঘাতকে কেন্দ্র করেই 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের কাহিনী আবর্তিত।

ফুকো বলেছিলেন, ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্যে আধিপত্যবাদী ডিসকোর্সের জন্ম দিয়েছে। নিজেদের মতো আইনি ব্যবস্থা, পুলিশ ও কারাগার সৃষ্টি করে দ্রোহী মানুষদের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে, চার দেয়ালের ভেতর আটকে রেখে, শাসন-শোষণকে অব্যাহত রেখেছে। সাঈদ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় দেখেছেন, নেটিভদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে আচরণের সীমা। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে আধিপত্যের এই চেহারা অত্যন্ত স্পষ্ট করেই ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। পাশ্চাত্য

শিক্ষায় আলোকিত শশিভূষণ ঔপনিবেশিক ক্ষমতাধর তিন ব্যক্তি বা শ্রেণী প্রতিনিধি – ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, স্টিমারের ইংরেজ ম্যানেজার এবং ইংরেজ পুলিশের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েও তাই পরাজিত হয়েছে। শুধু পরাজিত নয়, তাদের চক্রান্তে তাকে উল্টো যেতে হয়েছে জেলে। ফুকো যেমন বলেছেন – ঔপনিবেশিক শক্তি শশিভূষণকে কারাগারে আটকে রেখে, তার শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের শাসন-শোষণ টিকিয়ে রেখেছে।

উপনিবেশবাদী ইংরেজরা যে সেকালে কতটা ক্ষমতা ধারণ করতো তা "ছেলের দল ব্যাঘ্রের অনুবর্তী, শৃগালের পালের ন্যায় সাহেবের আড্ডার নিকটে শঙ্কিত কৌতূহল সহকারে ঘুরিতে থাকে"– এই উপমায়ও ধরা পড়েছে। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের দাপট এমন যে মেথরের অপমানও তার সহ্য হয় না। শুধু ম্যাজিস্ট্রেট নয়, নতুন বাণিজ্যপুঁজির প্রভাবে উপনিবেশের জলপথে আসা স্টিমারের ইংরেজ ম্যানেজারও 'দিশি পালের প্রতিযোগিতা' অর্থাৎ নেটিভের অযান্ত্রিক প্রতিযোগিতার প্রাধান্য বা ঔদ্ধত্য সহ্য করেনি :

> একটি মহাজনের নৌকা, কিছুদুর হইতে এই স্টিমারের সহিত পাল্লা দিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে ধরি-ধরি করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে পশ্চাতে পড়িতেছিল।...একস্থানে স্টিমারের পথ কিঞ্চিত বাঁকা ছিল, সেইখানে সংক্ষিপ্ততর পথ অবলম্বন করিয়া নৌকা স্টিমারকে ছাড়াইয়া গেল। ম্যানেজার-সাহেব আগ্রহভাবে রেলের উপর ঝুঁকিয়া নৌকার এই প্রতিযোগিতা দেখিতেছিল। যখন নৌকা তাহার পূর্ণতম বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্টিমারকে হাতদুয়েক ছাড়াইয়া গিয়াছে এমন সময়ে সাহেব হঠাৎ একটা বন্দুক তুলিয়া স্ফীত পাল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিয়া দিল। এক মুহূর্তে পাল ফাটিয়া গেল, নৌকা ডুবিয়া গেল, স্টিমার নদীর বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৬ক : ৩০২-৩০৩)

শশিভূষণ এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে আইনের আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু সেই প্রতিরোধ টেকেনি। তার নিজের সম্প্রদায়ের অত্যাচারিত মানুষই পৈশাচিক হিংস্র ঔপনিবেশিক শক্তির 'ভয়ে' তার পাসে এসে দাঁড়ায়নি। তবু শশিভূষণ সাঈদ-কথিত উপনিবেশের অধীন সেই মানুষ, যে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছে। ইংরেজ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। তার প্রতিবাদ দুইভাবে ঘটেছে : মৌখিকভাবে এবং আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে।

প্রথম আইনি লড়াই শশী করেছে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তার পোষা কুকুরের ঘি সংগ্রহ করে না দিলে মেথরকে দিয়ে নায়েব হরকুমারের কান ধরিয়ে তাঁবুর চারপাশে ঘুরিয়ে অপমানিত করে। দ্বিতীয় আইনি লড়াই শশী করে অল্পবয়স্ক 'ইংরাজনন্দন' স্টিমারের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে যার গুলিতে প্রতিযোগী দেশি নৌকার পাল ফেটে যায় ও নৌকা ডুবে যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে মাঝিদের পক্ষ হয়ে মামলা লড়েছে শশী।

এখানে ঔপনিবেশিক শাসকরা যে দেশি বা 'নেটিভ'দের সনাতন প্রযুক্তির তুলনায় তাদের যন্ত্রপ্রযুক্তিকে বেশি প্রাধান্যমূলক বলে ভাবছিল, তার ইঙ্গিত আছে। এর মধ্য দিয়ে তাদের ক্ষমতার দম্ভ যে কতটা 'হিংস্র' আর 'পৈশাচিক' হয়ে উঠেছিল, তাও প্রকাশ করতে ভোলেননি রবীন্দ্রনাথ। শুধু তাই নয়, এই ঘটনার পরও ঔপনিবেশিক শক্তি ও নব্যপ্রযুক্তির প্রতিনিধি ইংরেজ ম্যানেজার শাস্তি পাবে না বলেই উল্লেখ করেছেন তিনি। ঘটেছেও তাই, আইনের মারপ্যাঁচে নেটিভরাই শাস্তি পেয়েছে।

তৃতীয়বার শশী আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে খোদ আইনের রক্ষক পুলিশের বিরুদ্ধে। জেলার পুলিশ 'সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বাহাদুর' অন্যায়ভাবে নদীর মোহনা দিয়ে যাওয়ার সময় জেলেদের সাত-আট শো টাকার জাল কেটে দিলে সে তার প্রতিবাদ করে : "স্যার, জেলের জাল ছিঁড়িবার এবং এই চারি জন লোককে উৎপীড়ন করিবার তোমার অধিকার নাই।" উত্তরে পুলিশের বড়ো কর্তা তাকে হিন্দি ভাষায় গালি দিলে সে তাকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করে। শশীকে পুলিশের হাতে মার খেতে হয়, হাজতে যেতে হয় এবং সে মামলায় জড়িয়ে পড়ে। তার পাঁচ বছরের জেল হয়।

আইনি লড়াইয়ের এই ধারাবাহিকতা লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, শশী দু'বার নিজে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অত্যাচারিত ভারতীয়দের পক্ষে মামলা লড়েছে। তৃতীয়বার তার বিরুদ্ধেই মামলা হয়। হরকুমারের অপমান, মহাজনি নৌকার পাল ফুটো করে নদীতে ডুবিয়ে দেয়া, জেলেদের জাল কেটে দেওয়া এইসব অন্যায়ের কোন সুবিচার হয়নি। অপরাধীরা শাস্তি পায়নি। আইনের ফাঁক-ফোঁকর গলে তারা ছাড়া পেয়ে গেছে আর শাস্তি হয়েছে নিরীহ শশীর, যে অন্যায়ের প্রতিবিধান চেয়েছিল। আইনের কাছে সুবিচার আশা করা হলেও সেই আইনই তাকে ফাঁসিয়ে দেয়। অবশ্য তার স্বশ্রেণীর অসহযোগিতাও তাকে আইনের কাছ থেকে সুবিচার পেতে দেয়নি। ঐ তিনটি

ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারতীয়রা ইংরেজদের ভয়ে শশীর পক্ষাবলম্বন করার সাহস পায়নি। পায়নি তার কারণ ভারতীয়রা ছিল ক্ষমতাহীন, তাদের ক্ষমতাহীন করে রাখা হয়েছিল। নায়েবের বিস্ময়সূচক কথাতেই এই ক্ষমতাহীন, ভীত–সন্ত্রস্ত মানসিক অবস্থার ইঙ্গিত আছে :

> হাঁ। এও কি কখনো সম্ভব হয়। অপবিত্র জন্তুজাত পুত্রদিগের অস্থিতে এত ক্ষমতা! (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৬ক : ৩০৬)

ঔপনিবেশিক শাসকরা প্রবল ক্ষমতার অধিকারী ছিল বলেই তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত ভারতীয়রা আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে চায়নি। আইনি ব্যবস্থাও ছিল জটিল ও অন্তঃসারশূন্য একটি ব্যবস্থা। এজন্যেই পাল ফুটো হওয়া নৌকার মাঝি বলেছে :

> নৌকা তো মজিয়াছে, এক্ষণে নিজেকে মজাইতে পারিব না। প্রথমত পুলিশকে দর্শনি দিতে হইবে ; তাহার পর কাজকর্ম আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আদালতে ঘুরিতে হইবে ; তাহার পর সাহেবের নামে নালিস করিয়া কী বিপাকে পড়িতে হইবে ও কী ফল লাভ হইবে তাহা ভগবান জানেন। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৬ক : ৩০৩)

এই উক্তির মধ্যে ঔপনিবেশিক আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্রাত্যজনের অভিজ্ঞতার কথা চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে।

পরিচিত জেলেদের ক্ষেত্রে শশিভূষণকে আরও করুণ নির্মম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে :

> শশী তাহাদিগকে (অত্যাচারিত জেলে) সাক্ষী মানিবেন বলিয়া ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। স্ত্রী–পুত্র–পরিবার লইয়া যাহাদিগকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হয় পুলিশের সহিত বিবাদ করিলে তাহারা কোথায় গিয়া নিষ্কৃতি পাইবে। একটার অধিক প্রাণ কাহার শরীরে আছে। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৬ক : ৩০৬)

ঔপনিবেশিক শাসকদের আইন যে কতটা নিষ্ঠুর অর্থহীন অমানবিক, শশী নিজেও তা উপলব্ধি করেছে :

> "আইন অতি মন্দগতি-সে একটা বৃহৎ জটিল লৌহযন্ত্রের মতো ; তৌল করিয়া সে প্রমাণ গ্রহণ করে এবং নির্বিকারভাবে সে শাস্তি বিধান করিয়া দেয়, তাহার মধ্যে মানবহৃদয়ের উত্তাপ নাই।"

শশীর এই উপমিত হার্দিক উপলব্ধি যে কতটা যথার্থ, তার জেল হলে তা প্রমাণিত হয়ে যায়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ঔপনিবেশিক কালে উপনিবেশবাদীদের দ্বারা সৃষ্ট আইন ভারতীয়দের কোন উপকারে আসেনি, ঘটেছে উল্টোটি।

ফুকো যেমন বলেছেন - আইন, আইনের তথাকথিত রক্ষক এবং সরকারের প্রশাসনযন্ত্র – এই তিনের সমন্বয়ে আইনি ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ; এই গল্পেও তেমনি ঔপনিবেশিক ইংরেজ-শক্তি তার ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ রাখার জন্যে সমস্ত প্রতিরোধকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আইনের মারপ্যাঁচে শশীর শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থাৎ তাকে জেলে ঢুকিয়ে তার প্রতিরোধস্পৃহাকে চূর্ণ করে দিয়েছে। এই গল্পে "শশিভূষণের ভারতবর্ষীয় শান্তিপ্রিয়তা ইউরোপের ঔপনিবেশিক বর্বরতার কাছে মার খেয়েছে" (আনোয়ার ১৩৭০ : ৮৯)। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠিতে বলেছিলেন, "আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে" (আনোয়ার ১৩৭০ : ৯১)।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের চরিত্রগুলো তিনটি ধারায় প্রবহমান ; উপনিবেশের অধীনে তারা তিন ধরনের ভূমিকা পালন করেছে, তিনটি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে। এর একদিকে আছে ইংরেজ চরিত্রগুলো (ম্যাজিস্ট্রেট-স্টিমারের ম্যানেজার-পুলিশ সুপার), উপনিবেশের ভয়ে ভীত স্থানীয়রা (প্রাচ্যবাদীদের ব্যাখ্যা অনুসারে 'নেটিভ') এবং শশিভূষণ স্বয়ং। এদের মাধ্যমেই উপনিবেশের চরিত্রগুলোকে খুব স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে। এই গল্পের মূল দ্বন্দ্ব শুরু হয় ইংরেজ চরিত্র ম্যাজিস্ট্রেটের আচার-আচরণ দিয়ে। এই চরিত্রের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কোনো চরিত্র গ্রামে এলে তার উপস্থিতি নিয়ে ঘটে যেত কী তুলকালাম কাণ্ড :

> গ্রামে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়িল। বরকন্দাজ কন্স্টেবল খানসামা কুকুর ঘোড়া সহিস মেথরে সমস্ত গ্রাম চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছেলের দল ব্যাঘ্রের অনুবর্তী শৃগালের ন্যায় সাহেবের আড্ডার নিকটে শঙ্কিত কৌতূহল সহকারে

> ঘুরিতে লাগিল। নায়েব মহাশয় যথারীতি আতিথ্য-শিরে খরচ লিখিয়া সাহেবের মুর্গি আণ্ডা ঘৃত দুগ্ধ জোগাইতে লাগিলেন। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৬ক : ২৯৬)

কিন্তু কুকুরের ঘি না দেওয়া হলে ম্যাজিস্ট্রেট রেগে যায়। ব্রাহ্মণের জাত্যাভিমান ও মেথরের অবমাননা তার সহ্য হয় না। তিনি নায়েব হরকুমারকে ডেকে পাঠান। সাঈদ যেমন বলেছেন প্রাচ্যবাদীরা নেটিভদের জন্যে একধরণের আচরণবিধি (কোড) নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, রবীন্দ্রগল্পের এখানে তার ইঙ্গিত আছে। এই আচরণবিধি যে কতটা নির্দিষ্ট ছিল দ্বিতীয়বার তার পরিচয় পাই শশী ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে মামলা করার পর যে আদালতে মামলাটি চলছিল সেই আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ডেকে নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে মামলা করা ঠিক হয়নি বলে জানায়। মামলা তুলে নেয়ার জন্যে চাপ দেয়। শশী এতে রাজি না হলে জয়েন্ট সাহেব জমিদারকে চিঠি লিখে মামলা প্রত্যাহারের কথা বলে। বোঝা যায়, এখানেও সেই আচরণের সীমা বেঁধে দেয়া হলো, অর্থাৎ ভারতীয়রা একে অন্যের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে কিন্তু ইংরেজরা শত অপরাধ করলেও ভারতীয়রা তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে না।

জমিদারও নায়েবকে সতর্ক করে দিয়ে তার আচরণের সীমা বেঁধে দিয়েছে। তিনি "নায়েবকে হুকুম করিয়া দিলেন, মকদ্দমা তুলিয়া লইয়া যেন অবিলম্বে ছোটো বড়ো ম্যাজিস্ট্রেট যুগলকে ঠাণ্ডা করা হয়।" আসলে উপনিবেশবাদীদের আধিপত্যবাদী পদ্ধতিটি যে কতটা সুসংহত ছিল – এই গল্পে তার পরিচয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ এই আধিপত্যবাদী পদ্ধতির কথা চমৎকারভাবে 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে তুলে ধরেছেন।

ফলে, এর পরপরই আমরা দেখি উপনিবেশের অধীন মানুষ ও উপনিবেশবাদীদের সম্পর্ক হচ্ছে প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক আর এই সম্পর্ক তৈরি করে দেয় ব্রিটিশ উপনিবেশের অধীন ভারতীয়রাই :

> নায়েব কহিলেন, মা-বাপ কখনো-বা রাগ করিয়া শাস্তি দিয়াও থাকেন কখনো-বা আদর করিয়া কোলেও টানিয়া লন, ইহাতে সন্তানের বা মা-বাপের দুঃখের কোনো কারণ নাই। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৬ক : ২৯৮)

নায়েবের কাছে মা-বাপ হচ্ছেন ইংরেজরা।

স্থানীয় ভারতীয়দের আচরণের সীমা যে কতটা সুনির্দিষ্ট ছিল, স্টিমারের 'অল্প-বয়স্ক ম্যানেজার-সাহেব' তা 'দিশি পালের' নৌকাকে বুঝিয়ে দিয়েছে গুলি করে। সে

কিছুতেই দিশি পালের নৌকা তার যান্ত্রিক স্টিমারকে ছাড়িয়ে যাবে সহ্য করতে পারেনি।

ঔপনিবেশিক শাসন-পর্বে ভারতে ক্ষমতার বিন্যাসটি কেমন ছিল তার পরিচয়ও এভাবেই স্পষ্ট হয়ে গেছে 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে। গল্পটি থেকে থেকে বোঝা যায় ঔপনিবেশিক ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল ইংরেজ শাসক-বণিক শ্রেণী, তাদের সহায়তা করেছে জমিদার-নায়েব শ্রেণী এবং প্রান্তিকে ছিল সাধারণ কৃষক-জেলেদের অবস্থান। ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিয়েছে নায়েব-জমিদার ও ইংরেজরা আর সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হয়েছে সাধারণ প্রজাকুল। শশী এই শেষোক্ত সাধারণ মানুষেরই পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আইনি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। শশী নির্জনতাপ্রিয়, কিন্তু ব্যক্তি-অপমান, বিশেষ করে কোনো ভারতীয় নির্যাতিত হলে সে সেই অপমান বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইনি পথে প্রতিরোধ গড়ে নিতে চেয়েছে। শশী আদর্শবাদী ; ইংরেজদের চরিত্রগুলো যদি হয় ঔপনিবেশিক আধিপত্যকামী চরিত্র, তাহলে শশীর চরিত্রটি নিশ্চিতভাবে উনিশ শতকের ইউরোপীয় সভ্যতার দ্বারা বিভাবিত একটি চরিত্র, যাদের সৃষ্টি হয়েছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁস বা সন্দীপন-যুগের (এনলাইটেনমেন্ট) প্রভাবে। আইনি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে শশী প্রতিরোধের ডিসকোর্স গড়ে নিতে চেয়েছে।

শুধু 'মেঘ ও রৌদ্র' না, আরও বেশকিছু গল্প-যেমন 'দুর্বুদ্ধি' (১৩০৭), 'উলুখড়ের বিপদ'-এ ঔপনিবেশিক আইন যে ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা উপনিবেশের অন্তর্গত মানুষকে কতটা অধস্তন করে রেখেছিল তার কথা পাই। সেকালে অপঘাতে, যেমন সাপের কামড়ে কারো মৃত্যু হলে থানায় গিয়ে রিপোর্ট করতে হতো। কিন্তু থানায় গিয়ে রিপোর্ট করা সহজ ছিল না। আইনি মারপ্যাঁচে সাধারণ মানুষকে নানা হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। 'দুর্বুদ্ধি' গল্পে এক 'নেটিভ ডাক্তারের' জবানিতে এরকমই একটা ঘটনার কথা আমরা জানতে পারি।

গল্পের শুরুতেই পুলিশ ও থানার বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করা হয়েছে এইভাবে :

> আমি পাড়াগেঁয়ে নেটিভ ডাক্তার, পুলিশের থানার সম্মুখে আমার বাড়ি। যমরাজের সহিত আমার যে পরিমাণ আনুগত্য ছিল দারোগাবাবুদের সহিত তাহা অপেক্ষা কম ছিল না, সুতরাং নর ও নারায়ণের দ্বারা মানুষের যত বিবিধ রকমের পীড়া ঘটিতে পারে তাহা আমার সুগোচর ছিল। যেমন মণির দ্বারা বলয়ের এবং বলয়ের দ্বারা মণির শোভা বৃদ্ধি হয় তেমনি আমার মধ্যস্থতায়

> দারোগার এবং দারোগার মধ্যস্থতায় আমার উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৭ : ৩৬৫-৩৬৬)

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ঔপনিবেশিক কালের পুলিশ এবং আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ নানাভাবে হয়রানির শিকার হতো, তাদের কষ্ট দেওয়া হতো, আর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতো এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের। এই হয়রানির একটা ঘটনা গল্পের শেষেই ঘটেছে :

> নৌকায় উঠিবার সময় দেখি, থানার ঘাটে ডোঙা বাঁধা, একজন চাষা কৌপীন পরিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী রে।" উত্তরে শুনিলাম গতরাত্রে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে, থানায় রিপোর্ট করিবার জন্য হতভাগ্য তাহাকে দূরগ্রাম হইতে বহিয়া আনিয়াছে। দেখিলাম, সে তাহার নিজের একমাত্র গাত্রবস্ত্র খুলিয়া মৃতদেহ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জমিদারি কাছারির অসহিষ্ণু মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।
>
> বেলা একটার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তখনো সেই লোকটা বুকের কাছে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া বসিয়া ভিজিতেছে ; দারোগাবাবুর দর্শন মেলে নাই। আমি তাহাকে আমার রন্ধন-অন্নের এক অংশ পাঠাইয়া দিলাম। সে তাহা ছুঁইল না।
>
> তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া কাছারির রোগীর তাগিদে পুনর্বার বাহির হইলাম। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখি তখনো লোকটা একেবারে অভিভূতের মতো বসিয়া আছে। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। এখন তাহার কাছে, এই নদী, ঐ গ্রাম, ঐ থানা, এই মেঘাচ্ছন্ন আর্দ্র পঙ্কিল পৃথিবীটা স্বপ্নের মতো। বারংবার প্রশ্নের দ্বারা জানিলাম, একবার একজন কন্‌স্টেবল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ট্যাকে কিছু আছে কি না। সে উত্তর করিয়াছিল, সে নিতান্তই গরিব, তাহার কিছু নাই। কন্‌স্টেবল বলিয়া গেছে, "থাক বেটা, তবে এখন বসিয়া থাক।" (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৭ : ৩৬৭-৩৬৮)।

ঔপনিবেশিক নির্মম আইনি ব্যবস্থার কারণে সাধারণ কৃষকরা যে কতটা বিপন্ন ছিল, এই বর্ণনায় আছে তার বিবরণ। শুধু আইনি প্রক্রিয়ার অন্তঃসারশূন্যতা নয়, ঔপনিবেশিক সময়পর্বের কৃষকদের অবস্থাও যে কতটা করুণ হয়ে উঠেছিল, তার বর্ণনাও পাচ্ছি এখানে।

'শাস্তি' গল্পে নিঃস্ব-রিক্ত কৃষকের ছবি আরও করুণ, আরও নির্মম এক পরিবেশের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, যে-পরিবেশ উপনিবেশের স্বার্থেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। ইতিহাসবিদদের মতে ঔপনিবেশিক শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই বাংলার কৃষিজীবী সম্প্রদায় বিপর্যয়ের শিকার হয়, শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ কৃষক নিঃস্ব ক্ষেতমজুর শ্রেণীতে পরিণত হয়। সেই নিঃস্ব-দরিদ্র কৃষকদেরই প্রতিনিধি হচ্ছে 'শাস্তি' গল্পের ছিদাম-দুখিরাম। অন্যের জমিতে দিনমজুরি করে তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম করতে হয়। জমিদারের কাছারিতে বেগার খেটে সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরে দেখে হাড়িতে ভাত নেই।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশাসনের আধিপত্যবাদী, প্রাধান্যকামী চরিত্র সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল সুস্পষ্ট :

> তখন অরাজকতার চরগুলো কন্টকিত করে রেখেছিল রাষ্ট্রশাসন, অপ্রত্যাশিত অত্যাচারের অভিঘাতে দোলায়িত হত দিন রাত্রি। দুঃস্বপ্নের জাল জড়িয়ে ছিল জীবনযাত্রার সমস্ত ক্রিয়াকর্মে, গৃহস্থ কেবলই দেবতার মুখে তাকিয়ে থাকত, অপদেবতার কাল্পনিক আশঙ্কায় মানুষের মন থাকত আতঙ্কিত। মানুষ হোক আর দেবতাই হোক কাউকে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল, কেবলই চোখের জলের দোহাই পাড়তে হত। শুভ কর্ম এবং অশুভ কর্মের পরিণামের সীমারেখা ছিল ক্ষীণ। চলতে চলতে পদে পদে মানুষ হোঁচট খেয়ে খেয়ে পড়ত দুর্গতির মধ্যে। (মুসলমানীর গল্প, রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৮খ : ৭৬)

লক্ষণীয়, ঔপনিবেশিক শাসনের মাধ্যমেই সৃষ্টি হচ্ছিল এমন একটি শ্রেণীর যারা ছিল ইংরেজের কৃপাভাজন, উচ্ছিষ্টভোগী। উপনিবেশের মধ্যে থেকেই স্বশ্রেণীকে তারা শোষণ করেছে। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের হরকুমার এরকমই একটি চরিত্র, যিনি ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে সহায়তা করে, তাদের কৃপাভাজন হয়ে গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামোর মধ্যে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করেছে। ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা শুধু গ্রামীণ চরিত্র নায়েব হরকুমার নয়, শহুরে কিছু চরিত্রও তখন ইংরেজের কৃপালাভের আশায় মরিয়া হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটেই রচিত হয় 'রাজটিকা' (১৩০৫) গল্পটি।

একশ্রেণীর নব্যহিন্দু ঔপনিবেশিক কালপর্বে ইংরেজের অনুগ্রহ লাভের জন্যে যে কতটা হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছিল, 'রাজটিকা' গল্পে পাওয়া যায় তারই চমৎকার ছবি। গল্পের শুরুতেই দেখি পূর্ণেন্দুশেখর নামক এক বাঙালি হিন্দু "দ্রুতবেগে সেলাম-

চালনা দ্বারা রায়বাহাদুর পদবীর উত্তুঙ্গ মরুকূলে উত্তীর্ণ" হয়েছিল। তার প্রত্যাশা ছিল ইংরাজরাজ–সরকারের পদলেহন করে তাদের আরও সেবা করা। কিন্তু অকস্মাৎ পূর্ণেন্দুশেখরের মৃত্যু হলে সেই আশা অপূর্ণ থেকে যায়, এরপর শুরু হয় তার পুত্র নবেন্দু শেখরের রাজানুগৃহীত হওয়ার নব্যসাধনা :

> চঞ্চলা লক্ষ্মীর অচঞ্চলা সখী সেলামশক্তি পৈতৃক স্কন্ধ হইতে পুত্রের স্কন্ধে অবতীর্ণ হইলেন, এবং নবেন্দুর নবীন মস্তক তরঙ্গতাড়িত কুষ্মাণ্ডের মতো ইংরাজের দ্বারে দ্বারে অবিশ্রান্ত উঠিতে পড়িতে লাগিল। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৭ : ৩৩১)

শুধু নবেন্দুশেখর নয়, সে যে–পরিবারে দ্বার পরিগ্রহ করে, সেই পরিবারের বিলেতফেরত এক বিএ পাশ সদস্য প্রমথনাথ 'ইংরাজের সৌজন্যে মুগ্ধ' হয়ে 'ইংরাজ সাজ' পরে দেশে ফিরে আসে। কিন্তু একবার তাকে শুধু 'ইংরাজবেশধারী' হওয়ার কারণে ইংরাজ দারোগা কর্তৃক সমাদর এবং 'অন্য দেশীয়' বড়লোকদের অপমানিত করায় সে এই সমাদরের মধ্যে যে জাতীয় লজ্জা লুকিয়ে আছে সেটা বুঝতে পারে :

> ইংরাজবেশধারী প্রমথনাথও মানে মানে নামিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া দারোগা কহিল, "আপনি উঠিতেছেন কেন, আপনি বসুন–না।"
>
> এই বিশেষ সম্মানে প্রমথনাথ প্রথমটা একটু স্ফীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যখন গাড়ি ছাড়িয়া দিল, যখন তৃণহীন কর্ষণধূসর পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তসীমা হইতে ম্লান সূর্যাস্ত–আভা সকরুণরক্তিম লজ্জার মতো সমস্ত দেশের উপর যেন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং যখন তিনি একাকী বসিয়া বাতায়নপথ হইতে অনিমেষ নয়নে বনান্তরালবাসিনী কুণ্ঠিতা বঙ্গভূমির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তখন ধিক্কারে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং দুই চক্ষু দিয়া অগ্নিজ্বালাময়ী অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৭ : ৩৩২)

লক্ষণীয়, প্রমথনাথের বোধোদয়ের বর্ণনাটি প্রতীকী। প্রাকৃতিক একটি ছবির মাধ্যমে পশ্চিমী আধিপত্যের 'লজ্জা' যে ভারতবর্ষে 'পরিব্যাপ্ত' হচ্ছে তার উল্লেখ পাই। এই লজ্জার বোধই প্রমথনাথকে ইংরাজ বেশভূষা আগুনে পুড়িয়ে বিশুদ্ধ স্বদেশী হয়ে উঠতে সাহায্য করে। কিন্তু প্রমথনাথের বোধোদয় ঘটলেও এই পরিবারে জামাতা হয়ে আসা নবেন্দুশেখর ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর অনুগ্রহভাজন হয়ে ওঠার জন্যে নানা ছলের আশ্রয় নিতে থাকে এবং সেই সুবাদে হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে।

ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতি তার এই নির্লজ্জ আনুগত্য দেখে নবেন্দুর শ্যালিকাবর্গ তাকে নানাভাবে অপদস্থ করতে থাকে। একবার শ্যালিকাদের চাতুর্যের কারণে এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে তাকে শুনতে হয় : "Babu you are a howling idiot"- এই উক্তির মধ্যেই ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী রাজানুগ্রহের জন্যে কাঙাল সেকালের উঠতি বাবুদের কি চোখে দেখতো তা বোঝা যায়।

তবে শুধু রাজানুগ্রহ নয়, ভারতবাসীরা যে উপনিবেশবাদী শাসকের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে প্রতিরোধ গড়ে তুলছিল, নবেন্দুশেখরের স্বদেশীমন্ত্রে দীক্ষিতা শ্যালিকাবর্গ তার পরিচয় দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য একদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের লজ্জা এবং অন্যদিকে কংগ্রেসের অন্তঃসারশূন্যতা দুই-ই তাঁর 'আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি' দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। "কংগ্রেসের দেশপ্রীতির মুলে প্রমথনাথের মতো সত্যতম সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং দেশের জন্য সত্যকার কোনো বাস্তব বেদনাবোধ ছিল না" (আনোয়ার ১৩৭০ : ৭৫)। ফলে কংগ্রেসের সভায় নবেন্দুকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে কংগ্রেস সদস্যরা সবাই মিলে বিজাতীয় বিলেতি প্রথায় তারস্বরে "হিপ হিপ হুরে" শব্দে উৎকট অভিবাদন জানিয়েছে।

ঔপনিবেশিক কালপর্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো বাঙালি এই সময়ে নগরজীবনে প্রবেশ করে। কলকাতা নগরকে কেন্দ্র করে মার্কস-কথিত গ্রামীণ এশিয়াটিক সমাজে বিচলন দেখা দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যদিও শিল্পায়নের মধ্য দিয়ে ভারত শিল্পসমৃদ্ধ পুঁজিবাদী দেশে রূপান্তরিত হতে পারেনি, তবু রেল-স্টিমার চালু এবং পোস্ট-অফিস স্থাপনের কারণে নগর-পল্লীর ব্যবধান কমে আসতে থাকে। সামন্তমূল্যবোধেও চিড় ধরে। 'ত্যাগ' গল্পের প্যারিশঙ্করের জামাতা সাগরপারে চলে যাবার কারণে জাতিচ্যুত হলে কলকাতা নগরে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। আবার গ্রামে জাতিচ্যুত হওয়ার ভয়ে কলকাতা এনেই সুভার বিয়ের ব্যবস্থা দেখতে হয়। লক্ষণীয়, 'পল্লীগ্রামের সমাজদেবতার ভয়ে' এভাবেই নির্যাতিত মানুষ শহরে আশ্রয়-সন্ধান করেছে। অর্থাৎ 'মধ্যযুগীয় সমাজ-দেবতার শৃঙ্খল থেকে ব্যক্তি-মানুষের মুক্তির সনদ প্রথম যেখানে ঘোষিত হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক নামটি হচ্ছে কলকাতা।" (আনোয়ার ১৩৭০ : ১১০), যা উপনিবেশের একেবারে প্রত্যক্ষ সৃষ্টি। এই কলকাতাকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে পাশ্চাত্য শিক্ষাপুষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কলকাতাকেন্দ্রিক এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী নতুন নাগরিক মুল্যবোধের দ্বারা নিজেদের

জীবনকে অর্থময় করে তুলতে চাইলেও উপনিবেশবাদের দ্বারা আক্রান্ত এই শহর সবসময় নাগরিক জীবনে অনুকূল প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণাল তাই আক্ষেপ করে বলেছে ঃ

> ... তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে শামুকের সঙ্গে খোলসের যে-সম্বন্ধ কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই ; সে তোমার দেহমনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে ; তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৭ক : ৩২৯)

কলকাতাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী 'ব্যক্তি-মানুষের মুক্তি'র প্রশ্নটি বড় করে তুললেও এই কলকাতাকে ঘিরেই আর এক ধরনের অসঙ্গতি দেখা দেয়। রেনেসাঁ বা নবজাগরণের নামে সৃষ্টি হয় 'বাবু-শ্রেণী'। 'ঠাকুরদা' (১৩০২) গল্পের শুরুতে এই বাবুদের চমৎকার বর্ণনা আছে :

> নয়নজোড়ের জমিদারেরা এককালে বাবু বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তখনকার কালের বাবুয়ানার আদর্শ বড় সহজ ছিল না। এখন যেমন রাজা-রায়বাহাদুর খেতাব অর্জন করিতে অনেক খানা নাচ ঘোড় দৌড় এবং সেলাম-সুপারিশের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তখনো সাধারণের নিকট হইতে বাবু উপাধি লাভ করিতে বিস্তর দুঃসাধ্য তপশ্চরণ করিতে হইত। আমাদের নয়নজোড়ের বাবুরা পাড় ছিড়িয়া ফেলিয়া ঢাকাই কাপড় পরিতেন, কারণ পাড়ের কর্কশতায় তাঁহাদের সুকোমল বাবুয়ানা ব্যথিত হইত। তাঁহারা লক্ষ টাকা দিয়া বিড়ালশাবকের বিবাহ দিতেন এবং কথিত আছে, একবার কোনো উৎসব উপলক্ষে রাত্রিকে দিন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অসংখ্য দীপ জ্বালাইয়া সূর্যকিরণের অনুকরণে তাঁহারা সাচ্চা রুপার জরি উপর হইতে বর্ষণ করিয়াছিলেন।
>
> ইহা হইতেই সকলে বুঝিবেন সেকালে বাবুদের বাবুয়ানা বংশানুক্রমে স্থায়ী হইতে পারিত না। বহুবর্তিকাবিশিষ্ট প্রদীপের মতো নিজের তেল নিজে অল্পকালের ধুমধামেই নিঃশেষ করিয়া দিত। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৬ক : ৩৫০)

পাশ্চাত্য-শিক্ষার সূত্রে এই বাবুরাই পরবর্তীকালে নগরবাসী হলে প্রাচ্যের সবকিছুকে নির্বিচারে অস্বীকার করতে থাকে। মেকলে যে চেয়েছিলেন এদেশে এমন এক শিক্ষিত শ্রেণী তৈরি হবে যারা রক্তে হবে ভারতীয় কিন্তু আচার-আচরণে ইংরেজ-ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের সেই ইচ্ছে কিছুটা হলেও চরিতার্থ হয়েছিল ; ইয়ংবেঙ্গলদের (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নব্যবঙ্গ) সৃষ্টিই তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের

কয়েকটি গল্প, যেমন 'করুণা' (১২৮৫), রবিবার (১৩৪৬), 'মুসলমানীর গল্প' (১৩৬২) ইত্যাদিতে এই বাবু-শ্রেণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

'করুণা' গল্পের নরেন্দ্র পল্লীগ্রাম থেকে কলকাতার 'ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রেরিত" হয়। কলকাতার প্রভাবে সে অচিরেই তথাকথিত 'বাবু' হয়ে ওঠে ; "পানের পিকে ওষ্ঠাধর প্লাবিত করিয়া, মাথায় চাদর বাঁধিয়া, দুই পার্শ্বের দুই সঙ্গীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া...নরেন্দ্র প্রদোষে কলিকাতার গলিতে গলিতে মারামারি খুঁজিয়া বেড়াইত, গাড়িতে ভদ্রলোক দেখিলে কদলীর অনুকরণে বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিত, নিরীহ পান্থ বেচারিদিগের দেহে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নির্দোষীর মতো আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিত।" পল্লীর লোকেরা যখন এরকম স্বভাবের জন্যে তাকে জাতিচ্যুত করলো তখন তিনি তাতে 'কটাক্ষপাতও' করলেন না ; কলকাতার বাগবাজারে গিয়ে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে লাগলেন। বন্ধু হিসেবে জুটে গেল "সমাজসংস্কারক গদাধরবাবু, কবিতা-কুসুমমঞ্জুরীপ্রণেতা কবিবর, স্বরূপচন্দ্রবাবু" এবং আরও অনেকে। নরেন্দ্র এবং তার এই বন্ধুদের রবীন্দ্রনাথ ইয়ংবেঙ্গলদের আদলে এই গল্পে সৃষ্টি করেছেন। 'স্ত্রীলোকদের কষ্টমোচনে'র জন্যে তারা 'অন্তঃপুরের প্রাচীর' ভেঙে ফেলতে উৎসাহী, কিন্তু সেই প্রাচীর ভেঙে ফেলা দূরে থাক, একবার কোনো এক 'অন্তঃপুরের প্রাচীর লঙ্ঘন' করতে গেলে ম্যাজিস্ট্রেট তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো যে, এক বিধবাকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই তারা 'অন্তঃপুরের কারাগার' থেকে মুক্ত করে 'স্বাধীনতার সুমিষ্ট আস্বাদ' দেবেন। নরেন্দ্র বিধবার সব ভার নিলেন, "ক্রমে ত্রিভঙ্গচন্দ্র বিশ্বম্ভর ও জন্মেজয়বাবু আসিলেন, ক্রমে সন্ধ্যাও হইল, প্লেট আসিল, বোতল আসিল। গদাধরবাবু স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়া ও স্বরূপবাবু জ্যোৎস্না-রাত্রির বিষয়ে নানাবিধ কবিতাময় উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া শুইয়া পড়িলেন, ত্রিভঙ্গচন্দ্র ও বিশ্বম্ভরবাবু স্খলিত স্বরে গান জুড়িয়া দিলেন, নরেন্দ্র ও জন্মেজয় কাহাকে যে গালাগালি দিতে লাগিলেন বুঝা গেল না।"

ইয়ংবেঙ্গলদের (নব্যবঙ্গ) রবীন্দ্রনাথ কী চোখে দেখতেন 'করুণা' গল্পের নরেন্দ্র, ত্রিভঙ্গচন্দ্র, জন্মেজয়, গদাধরবাবু, বিশ্বম্ভরবাবুর কর্মকাণ্ড ও বর্ণনায় সেই দৃষ্টিভঙ্গিটি সুস্পষ্ট। এই গল্পে ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত দেশকালের সঙ্গে সম্বন্ধহীন মানুষদের জীবনাচরণের অসঙ্গতি, লক্ষহীনতা এবং অন্তঃসারশূন্যতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

'করুণা' ছাড়াও আরও কয়েকটি গল্পে এদের বর্ণনা পাওয়া যায় :

> ক. ছেলেটি মোচাখালির পরমানন্দ শেঠের মেজো ছেলে। অনেক টাকার তাবিল চেপে বসে আছে, বাপ ম'লেই তার চিহ্ন পাওয়া যাবে না। ছেলেটি ছিল বেজায় শৌখিন–বাজপাখি উড়িয়ে, জুয়ো খেলে, বুলবুলের লড়াই দিয়ে খুব বুক ঠুকেই টাকা ওড়াবার পথ খোলসা করেছিল। নিজের সম্পদের গর্ব ছিল তার খুব, অনেক ছিল মাল। মোটামোটা ভোজপুরী পালোয়ান ছিল সব বিখ্যাত লাঠিয়াল। সে বলে বেড়াত, সমস্ত তল্লাটে কোন্ ভগ্নীপতির পুত্র আছে যে ওর গায়ে হাত দিতে পারে। মেয়েদের সম্বন্ধে সে ছেলেটি বেশ একটু শৌখিন ছিল – তার এক স্ত্রী আছে আর একটি নবীন বয়েসের সন্ধানে সে ফিরছে। (মুসলমানী গল্প, রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৮খ ৭৭)

> খ. অভীকের জীবনে এর পরবর্তী ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং অস্পষ্ট।.... মুসলমান খালাসিদের দলে মিশে চার পয়সার পরোটা আর তার চেয়ে কম দামের শাস্ত্রনিষিদ্ধ পশুমাংশ খেয়ে ওর দিন কেটেছে সস্তায়। লোকে বলেছে ও মুসলমান হয়েছে ; ও বলেছে, মুসলমান কি নাস্তিকের চেয়ে বড়ো। হাতে যখন কিছু টাকা জমল তখন অজ্ঞাতবাস থেকে বরিয়ে এসে আবার সে পূর্ণ পরিস্ফুট আর্টিস্টরূপে বোহেমিয়ানি করতে লেগে গেল। শিষ্য জুটল, শিষ্যা জুটল। চশমাপরা তরুণীরা তার স্টুডিয়োতে আধুনিক বেআব্রু রীতিতে যে-সব নগ্নমনস্তত্ত্বের আলাপ-আলোচনা করতে লাগল, ঘন সিগারেটের ধোঁয়া জমল তার কালিমা আবৃত করে। (রবিবার, রবীন্দ্রনাথ ১৩ : ২৪২)

৫

'নষ্টনীড়' (১৩০৮) গল্পে ঔপনিবেশিক শাসনের ভিন্ন একটি দিকের পরিচয় পাই আমরা। উপনিবেশের অধীনে মতাদর্শিক-বৌদ্ধিক সংগ্রামে নিযুক্ত থাকার কারণে সাংবাদিক ভূপতি সংবেদনশীল স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দিতে পারেনি। এদিকে ঔপনিবেশিক সংগ্রামে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সদর্থক প্রভাবে নারী সচেতনতা বাড়ছে, ফলে ভূপতি-চারুর জীবনে নেমে এসেছে ট্রাজেডি। রবীন্দ্র-ভাবনার কেন্দ্রে সেই ঔপনিবেশিক পর্বেই চলে এসেছে নারী। নারীকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছেন তাঁর গল্পে। চারু যখন অমলকে লক্ষ করে মনে মনে বলে : 'অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই"।– বিবাহোত্তর এই ভাবনা রবীন্দ্রপূর্বকালে ছিল অকল্পনীয়। চারুর পথ ধরেই তাই সৃষ্টি করতে পেরেছেন 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণালকে, যে পুরুষের আধিপত্যকে অস্বীকার করে বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে। উপনিবেশের অধীনে

থাকার পরও যে ভারতীয় মানসে রূপান্তর ঘটছিল, এই গল্পে পাওয়া যায় তারই পরিচয়। অর্থাৎ ততদিনে গড়ে উঠতে শুরু করেছে উপনিবেশ-বিরোধী পাল্টা বৌদ্ধিক-নৈতিক ডিসকোর্স বা ভাবনা, যা মানবিক।

'অপরিচিতা' (১৩২১) গল্পটি দুই দিক থেকে এই পাল্টা ডিসকোর্সেরই দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। ইংরেজ বা ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণী সব সময় যে সুবিধা পেয়ে এসেছে, ঐ গল্পে আছে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ।

গল্পটিতে দেখা যায় এক জেনারেল-সাহেব রিজার্ভেশন ছাড়াই ভারতীয় যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে উঠতে চাইলে কল্যাণী নামের এক যুবতী তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এখানে দুই শ্রেণীর চরিত্রকে পাচ্ছি : একশ্রেণীর চরিত্র যারা উপনিবেশ স্থাপনের জন্যে ভারতে এসেছে, আর একশ্রেণীর যারা এখানকার অধিবাসী 'নেটিভ' বা 'আদার'। এই দুই চরিত্রের মধ্যে সংঘাতের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় 'অপরিচিতা' গল্পে :

> মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, "না আমরা গাড়ি ছাড়িব না।"
>
> সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, "না ছাড়িয়া উপায় নাই।"
>
> কিন্তু মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল।....ইতিমধ্যে আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আর্দালিকে প্রথমে ইশারা করিয়াছিল। তাহার পর মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তাহার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া স্টেশন-মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা গেল, গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৭খ : ৩৬৬)

রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির দিক থেকে ভারতীয়দের পরিবর্তে আধিপত্যকামী ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রাধান্য দেওয়া হলে, নেটিভদের অপমানিত করার চেষ্টা হলে, প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিল 'অপরিচিতা' গল্পের অসামান্য নারী কল্যাণী। 'বদনাম' গল্পে এরকমই অন্য এক অনন্য নারী সৌদামিনীর দেখা পাই আমরা ; কিছুটা ভিন্ন আচরণে, অসামান্য ভূমিকায়। অসামান্য বলছি কারণ, পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টারের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সে গোপনে ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবার ব্যাপারে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছে,

নিজেই বিপ্লবী হয়ে উঠেছে।

সৌদামিনীই রবীন্দ্রনাথের গল্পের একমাত্র নারীচরিত্র যে ইংরেজ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। শুধু অংশগ্রহণ বললে ভুল হবে, বিপ্লবীদের চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ পুলিশ স্বামীকেও সে যে চাতুর্যের সঙ্গে বিভ্রান্ত করেছে, তাতে সে-ই হয়ে উঠেছে বিপ্লবের মূল চালিকাশাক্তি। এই গল্পে জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টির যে চেষ্টা বিপ্লবীদের মধ্যে দেখা যায়, সৌদামিনী তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ঔপনিবেশিক শাসকদের পক্ষাবলম্বী স্বামীকে উদ্দেশ করে তাই সে বলে :

> তুমি তো জান আমাদের দেশে দৈবাৎ দুই-একজন সত্যিকার পুরুষ দেখা যায়। তোমাদের একমাত্র চেষ্টা এঁদের একেবারে নির্জীব করে দিতে। আমরা দেশের মেয়েরা যদি এই সব সুসন্তানদের আপন প্রাণ দিয়ে রক্ষা না করি তবে আমাদের নারীধর্মকে ধিক্। তোমার আগোচরে নানা কৌশলে এতদিন এই কাজ করে এসেছি। যাঁর হুকুম- এও আমাকে মানতে হবে। এই আমার দেবতাকে আজ তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে আমি সবে দাঁড়াবো।....আমি চিরদিন তাঁর পিছন পিছন থেকে শাস্তির শেষ পালা পর্যন্ত যাব। তুমি সুখে থেকো। তোমার ভয় নেই, ইচ্ছা করলেই তুমি নূতন সঙ্গিনী পাবে। আর যা কর আমাকে দয়া করো না। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৮খ : ৬৬)

সৌদামিনীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনাতেও বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে যায়। এতদিন ধরে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত স্বামীর প্রতি অনুগত, নিবেদিত সতী-সাধ্বী স্ত্রীর 'আইডিয়াল'কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভেঙে দেন :

> মেয়েদের চাতুরী দিয়ে ঘরকন্না চালাতে হয়, সেটা দেশের সেবায় লাগালে ঐ স্ত্রীবুদ্ধি ষোলো-আনা কাজে লাগতে পারে। পুরুষরা বোকা, তারা আমাদের বলে সরলা, অখলা- এই নামের আড়ালেই আমরা সাধ্বীপনা করে থাকি আর ঐ খোকার বাবারা মুগ্ধ হয়ে যায়। আমরা অবলা অখলা— কুকুরের গলার শিকলের মতো এই খ্যাতি আমরা গলায় পরে থাকি, আর তোমরা আমাদের পিছন পিছন টেনে নিয়ে বেড়াও। তার চেয়ে সত্যি কথা বল-না কেন- সুযোগ পেলে তোমরাও ঠকাতে জান, সুযোগ পেলে আমরাও ঠকাতে জানি। আমরা এত বোকা নই যে শুধু ঠকবই আর ঠকাব না। বুড়িগুলো বলে থাকে 'সদু বড়ো লক্ষ্মী', অর্থাৎ রাঁধতে বাড়তে ঘর নিকোতে সদুর ক্লান্তি নেই। এইটুকু বেড়ার মধ্যে আমাদের সুনাম। দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে আর যাঁরা

> মানুষের মতো মানুষ তাঁদের হাতে হাতকড়ি পরছে, আমরা বেঁধে বেড়ে বাসন মেজে করছি সাধ্বীগিরি। আমরা অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতন একটা-কিছু করতে পারি তা হলে আমাদের রক্ষা, এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম। আমাদের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দেখো তো দেখবে – হয়তো আছে কোথাও কিছু কলঙ্কের চিহ্ন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই আছে জ্বলন্ত আগুনের দাগা। নিছক আরামের খেলার দাগা নয়। মেরেছি, কিন্তু মরেছি তার অনেক আগে। সংসারে মেয়েরা দুঃখের কারবার করতেই এসেছে। সেই দুঃখ কেবল আমি ঘরকন্নার কাজে ফুঁকে দিতে পারব না। আমি চাই সেই দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে দেব দেশের যত জমানো আঁস্তাকুড়। লোকে বলবে না সতী, বলবে না সাধ্বী। বলবে দজ্জাল মেয়ে। এই কলঙ্কের-তিলক-আঁকা চাপ পড়বে তোমার সদুর কপালে, আর তুমি যদি মানুষের মতো মানুষ হও তবে তার গুমোর বুঝতে পারবে। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৮খ : ৬৪)

লক্ষণীয়, উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করতে গিয়েই নারী তার অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় সমাজে নারীকে এতদিন শুধু নিপুণ ঘরকন্যা আর সতী-সাধ্বীর মাপকাঠিতে মর্যাদা দেয়া হতো, তার যে অন্য কোনো ভূমিকা থাকতে পারে তা কখনোই স্বীকার করা হয়নি। কিন্তু উপনিবেশ-বিরোধিতার মুহূর্তে সে আর এই কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখে নিঃশেষ করতে চায় না। পুরুষের তুলনায় নারী যে আরও উঁচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হচ্ছে সৌদামিনী সেই কথাই 'গুমোর বুঝতে পারবে' বলে উল্লেখ করেছে।

শুধু এই আত্মমর্যাদা অর্জনই নয়, জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টিতেও এই নতুন কালের নারী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এ জন্যে যদি তার গায়ে তথাকথিত সমাজপতিদের কলঙ্কের চিহ্ন লাগে, তাতেও ক্ষতি নেই ; ঘরকন্যার মধ্য দিয়ে জীবন নিঃশেষ হয়ে যাবে এ আর আজ অনুমোদনযোগ্য নয়।

তবে শুধু নারীর কাছে নারী নয়, পুরুষের ভাবনাতেও উপনিবেশ-বিরোধিতার মুহূর্তে নারী নতুন রূপে ধরা দিচ্ছে। ঔপনিবেশিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে কেউ কেউ উপনিবেশকে অন্ধভাবে অনুকরণ করছে বলে যেমন ভেবেছেন রবীন্দ্রনাথ, তেমনি এই শিক্ষাই যে কোনো কোনো ভারতীয়ের মধ্যে নারীমুক্তির ভাবনা জাগিয়ে দিয়েছে, তাও লক্ষ করেছেন। 'পাত্র-পাত্রী' গল্পের কলেজ পেরুনো শিক্ষিত সনৎকুমার তাই ভাবতে পারছে :

> যে-স্ত্রীকে আইডিয়ালের পথে সঙ্গিনী করতে চাই সেই স্ত্রী ঘরকন্নার গারদে পায়ের বেড়ি হয়ে থাকবে এবং প্রত্যেক চলাফেরায় ঝংকার দিয়ে পিছনে টেনে রাখবে, এমন দুর্গ্রহ আমি স্বীকার করে নিতে নারাজ ছিলুম। আসল কথা, আমাদের দেশের প্রহসনে যাদের আধুনিক ব'লে বিদ্রূপ করে, কলেজ থেকে টাটকা বেরিয়ে আমি সেইরকম নিরবচ্ছিন্ন আধুনিক হয়ে উঠেছিলুম। আমাদের কালে সেই আধুনিকের দল এখনকার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। আশ্চর্য এই যে, তারা সত্যই বিশ্বাস করত যে, সমাজকে মেনে চলাই দুর্গতি এবং তাকে টেনে চলাই উন্নতি। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৭ক : ৩৮৮)

উপনিবেশ-বিরোধী ডিসকোর্স এভাবেই রবীন্দ্র-ভাবনায় নারীমুক্তির কথা ঘোষণা করেছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলো এ কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৬

রবীন্দ্রনাথের উপনিবেশ-বিরোধিতার বৈশিষ্ট্য ছিল অভিনব। উপনিবেশবাদী আধিপত্যকে তিনি যেমন চ্যালেঞ্জ করেছেন তেমনি সামন্তমনোভাবাপন্ন স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চালিত ব্যক্তিমানুষের দ্বারা নির্জিত বিপন্ন মানুষকে উপনিবেশেরই অধীন ব্যক্তির শরণাপন্ন করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যটি অন্তত একটি গল্পে ফুটে উঠতে দেখছি আমরা। গল্পটির নাম 'দিদি'। এই গল্পের শশী তার ভাইকে রক্ষা করতে গিয়ে বাঙালি ডেপুটির কাছ থেকে কোন ধরনের সাড়া পায়নি, বরং প্রতিকূল ব্যবহার পেয়েছে। তার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে এক ইংরেজ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এই ঘটনাটি একেবারে অভাবনীয় নয়, সেকালের প্রেক্ষাপটে এর সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে।

ঔপনিবেশিক কালপর্বে ভারতবর্ষে যখন সামন্ত অনুশাসন ও মূল্যবোধকে ত্যাগ করে পাশ্চাত্যের আলোকপর্বের (Enlightenment) নানা ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আধুনিকতার পথে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন সেই রূপান্তরকর্মে কোনো কোনো ইংরেজ এক ধরনের সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। এ দেশের পাশ্চাত্য-প্রভাবিত অংশ নারীমুক্তির ব্যাপারে এগিয়ে এলে ইংরেজরাও তাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শোষণ বজায় থাকলেও "নারীর মুক্তি ও মর্যাদা সংক্রান্ত আন্দোলনে তাদের সহায়তা অকৃত্রিম ছিল" (আনোয়ার ১৩৭০ : ৮০)। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট শশীর আবেদনে যেভাবে সাড়া দেয়, তা ছিল নারীমুক্তি সম্পর্কে সেকালের ঔপনিবেশিক শক্তির সাধারণ মনোভাবেরই অভিব্যক্তি।

যথার্থই বলেছেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, 'দিদি' গল্পের শশী ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, স্বামী জয়গোপালের তুলনায় নিরপেক্ষ শাদা চামড়ার ম্যাজিস্ট্রেট তার পিতৃমাতৃহীন ভাই নীলমনির অনেক ভালো 'মা-বাপ' হতে পারবে। আর এভাবেই শশী আত্মস্বার্থের দ্বারা আচ্ছন্ন ব্যক্তির (স্বামীর) ভারতীয় আত্মীয়বন্ধনকে অস্বীকার করে ভাইকে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে তুলে দেয়। আমরা আগেই লক্ষ করেছি, ঔপনিবেশিক পদ্ধতিটাই ছিল পুরোপুরি 'পিতৃতান্ত্রিক' ভাবাদর্শের প্রতীক। এই গল্পের মূল থিমও পিতৃতান্ত্রিক। শশীর স্বামী পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাবেই শশীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে, তার অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাইয়ের সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে চেয়েছে। কিন্তু শশী ভাইকে ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে তুলে দেওয়ায় এই ইচ্ছাকে সে আর চরিতার্থ করতে পারেনি। অর্থাৎ ভারতীয় পিতৃতান্ত্রিক প্রভাববলয় থেকে ভাইকে মুক্ত করে শশী তাকে তুলে দেয় ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে, যে শক্তি আবার পিতৃতান্ত্রিকতার প্রতীক। এই ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে সরাসরি সংযোগে আসার কারণেই শশীর নিজেরও একধরনের রূপান্তর ঘটে যায় ; সনাতন ভারতীয় নারীর বিচরণক্ষেত্র ছেড়ে সে বাইরের পৃথিবীতে এসে দাঁড়াবার জায়গা করে নেয়, যদিও পরিণামে সে আবার স্বামীর সংসারে ফিরে গিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রাধান্যকেই স্বীকার করে নিয়েছে।

'ঔপনিবেশিক বিষয়' (ব্রেকেনরিজ এবং ভ্যান দার ভীর ১৯৯৩ : ১৪০) হিসেবে 'দিদি' গল্পের রূপকটিও লক্ষণীয়। পিতৃমাতৃহীন ভাই-ই হচ্ছে ভবিষ্যতের 'ঔপনিবেশিক বিষয়', যে তার দিদির জন্যে শোকগ্রস্ত, নিজের অতীতের জন্যে ভাবিত, কিন্তু চূড়ান্ত পরিণাম হিসেবে আবার সাহেবের বাঁ-হাতে আলিঙ্গনাবদ্ধ। অন্যদিকে শশীর ডান হাত আবার নির্দেশ করছে ভারতের ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ। আসলে শশীই ভারতীয় সনাতন 'স্থির সাংস্কৃতিক' পরিবেশের মধ্যে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়, পুরুষ ভাইকে নিয়ে আসে পরিবর্তনশীল ঔপনিবেশিক ভবিষ্যতের কাছে। যতদিন নীলমণি 'বাড়ি' ফিরে না পায় ততদিন সে সাহেবের কাছেই থাকুক এটাই তার ইচ্ছে ঃ

> (ম্যাজিস্ট্রেট বলছেন) "... তুমি তোমার ভাইটিকে লইয়া নির্ভয়ে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পারে।"
>
> শশী কহিল, "সাহেব, যতদিন নিজের বাড়ি ও না ফিরিয়ো পায়, ততদিন আমার ভাইকে বাড়ি লইয়া যাইতে আমি সাহস করি না। এখন নীলমণিকে তুমি নিজের কাছে না রাখিলে ইহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।"

সাহেব কহিলেন, "তুমি কোথায় যাইবে?"

শশী কহিল, "আমি আমার স্বামীর ঘরে ফিরিয়া যাইব, আমার কোন ভাবনা নাই।"

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া অগত্যা এই গলায়-মাদুলি-পরা কৃশকায় শ্যামবর্ণ গম্ভীর প্রশান্ত মৃদুস্বভাব বাঙালির ছেলেটিকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন।

তখন শশী বিদায় লইবার সময় বালক তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সাহেব কহিলেন, "বাবা, তোমার কোন ভয় নেই- এসো।"

ঘোমটার মধ্য হইতে অবিরল অশ্রু মোচন করিতে করিতে শশী কহিল, 'লক্ষ্মী ভাই, যা, ভাই, আবার তোর দিদির সঙ্গে দেখা হবে।"

এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া কোনোমতে আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল ; অমনি সাহেব নীলমণিকে বাম হস্তের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, সে 'দিদি গো, দিদি', করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। শশী একবার ফিরিয়া চাহিয়া দূর হইতে প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে তাহার প্রতি নীরবে সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে চলিয়া গেল।" (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৬ক : ৩৪২-৩৪৩)

একটু দীর্ঘ হলেও উদ্‌ধৃত অংশটি উপনিবেশবাদী শক্তির সঙ্গে স্থানীয় ভারতীয়দের সম্পর্কটি তখন কেমন ছিল, ভবিষ্যতেই-বা কেমন দাঁড়াতে পারে, তার ইঙ্গিত পাই। এখানে যে 'বাড়িটি'র কথা বলা হচ্ছে সেই বাড়িই হচ্ছে আসলে ভারতীয়দের পরবর্তীকালে ফিরে পাওয়া স্বদেশ, প্রথমে যা লেখক-ভাবুকদের কল্পনায় ধরা দেয়, ইংরেজদের সহায়তায় পাওয়া যেতে পারে বলে মনে হয়েছে, পরে তা-ই হয়ে ওঠে বাস্তব এক জাতিরাষ্ট্র ; রবীন্দ্রনাথ যদিও উগ্রতার কারণে এই জাতিরাষ্ট্রে বিশ্বাস করতেন না। 'গলায়-মাদুলি-পরা কৃশকায় শ্যামবর্ণ' বর্ণনাংশেরও (parenthesis) তাৎপর্য আছে। এই বর্ণনা আসলে ভারতীয় সমাজেরই সনাতন, নির্জিব, বদ্ধ অবস্থার প্রতীকী বর্ণনা। ঠিকই বলেছেন স্পিভাক, বিদায়ের মুহূর্তে শশীর "দক্ষিণ হস্তে তাহার (নীলমণির) প্রতি নীরবে সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে চলিয়া" যাওয়ার মধ্যে ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে দেশের মানুষকে (এখানে নীলমণি) ছেড়ে যাওয়ার বেদনা জেগে উঠেছে। কারণ তখনো, ইতিহাসের ঐ পর্বে, ঔপনিবেশিক শক্তি প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়দের জন্যে কতটা সহায়ক হয়ে উঠতে পারবে, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিত ছিলেন না।

এইখানেই স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন ওঠে। রবীন্দ্রনাথ কি তাহলে ঔপনিবেশিক

শক্তিকে ভেবেছিলেন ভারতীয়দের মুক্তি বা স্বাধীনতার জন্যে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে? উত্তরটি দিয়েছেন প্রখ্যাত ভারতীয় সমাজ-রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সাবঅল্টার্ন ইতিহাসচর্চার অগ্রণী লেখক পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করছি, ভারতের উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় তিনটি স্তরে বিভক্ত দেখেছেন : সূচনা পর্ব, কৌশলী পর্ব এবং অর্জনের পর্ব। প্রথম পর্বে উপনিবেশের অধীন ভাবুকদের ধারণা ছিল ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতার সূত্রে উপনিবেশগুলোর মুক্তি আসতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে তাদের সেই ভুল ভেঙে যায়, তারা সহযোগিতা-বিরোধিতার দ্বান্দ্বিক পথে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরোধিতা করেন। তৃতীয় স্তরে আর কোন দ্বন্দ্ব নয়, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হবে স্বাধীনতা বা মুক্তি – এই সিদ্ধান্তে পৌছান তাঁরা। রবীন্দ্রনাথ এই তিনটি পথেই ব্রিটিশদের বিরোধিতা করেছেন। ফলে প্রথম দিকে তাঁর ধারণা ছিল ঔপনিবেশিক এই শক্তিই ভারতীয়দের বৌদ্ধিক-সামাজিক (রবীন্দ্রনাথের কাছে 'সমাজ' ছিল 'রাষ্ট্রে'র বিকল্প, তিনি রাষ্ট্রধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না) মুক্তি এনে দিতে পারে। 'দিদি' ইতিহাসের ঐ ক্রান্তিকালেই লেখা। রবীন্দ্রনাথ তাই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে ভারতীয়দের সহায়ক শক্তি বলে গণ্য করেছেন, যদিও পরে তাঁর সেই ভুল ভেঙে যায় ; 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে যার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

'দিদি' গল্পটি ঔপনিবেশিক কালের টেক্সট হিসেবে আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সাঈদ থেকে শুরু করে স্পিভাক পর্যন্ত সবাই লক্ষ করেছেন, সাংস্কৃতিক আধিপত্যের ঐ যুগে উপনিবেশের অধীন দেশগুলোর মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের অধিকাংশই ছিল 'নারীত্বধর্মী' (সাহিত্যিক টেক্সটের জন্যে দ্রষ্টব্য বঙ্কিমচন্দ্র, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জন্যে রোনাল্ড ইনডেন)। দেশীয় লেখকেরা 'নারীমূর্তি গঠনে'র (ব্রেকেনরিজ ও ভ্যান দার ভীর ১৯৯৩ : ১৪০) মধ্য দিয়েই ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে চেয়েছেন, লড়েছেন। রবীন্দ্রনাথও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না, দেশচেতনা সৃষ্টির জন্যে তিনি নারীভাবমূর্তিকেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নারীত্বের কোমল-শান্ত রূপই তাঁর আরাদ্ধ ছিল না, তিনি নারীর রুদ্রমূর্তিরও বন্দনা করেছেন (এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে স্পষ্ট ছিলেন নজরুল, দ্রষ্টব্য তাঁর কবিতা 'রক্তাম্বরধারিনী মা')। অবশ্য শুধু এ-ও নয়, 'নারীমুক্তি'ই (ব্রেকেনরিজ ও ভ্যান দার ভীর ১৯৯৩ : ১৩৮, মাসুদুজ্জামান ১৯৯৮) হয়ে উঠেছে 'রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পের বিষয়বস্তু। অর্থাৎ তিনি শুধু ঔপনিবেশিক আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে নারীকে প্রতীক করে তোলেননি, সামন্তবাদ-

উপনিবেশবাদের দ্বারা নির্জিত নারীকেও মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। কেন্দ্র/প্রান্তের যে ধারণা সৃষ্টি করে পশ্চিম পূর্বদেশগুলোকে শাসন করতো সেই ধারণাকে ভেঙে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আধিপত্যের বিরুদ্ধে 'উঠতি' দেশ হিসেবে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে সামাজিক শ্রেণীকাঠামোরও পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই পরিবর্তনেরই অংশ হিসেবে গ্রামীণ নারীর জ্ঞানতাত্ত্বিক রূপান্তর ঘটিয়ে শশী, চন্দরাদের সৃষ্টি করেছেন। স্পিভাক অবশ্য এই বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি 'সংস্কৃতিঘেঁষা' 'মাতৃভাষা' বাংলায় লেখা হয়েছে বলে একে উপনিবেশ-বিরোধী গল্প বলে আখ্যাত করেছেন।

৭

উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গিয়ে উপনিবেশের অধীন মানুষদের এক সময় 'জাতিরাষ্ট্র' সৃষ্টির ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। এই জাতিরাষ্ট্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ছিল এক ধরনের নিজস্ব ভাবনা। তিনি তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধে এবং 'গোরা' (১৯০৯) ও 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে এই জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না, এর স্বরূপ কি হতে পারে, জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টির মুহূর্তে কী কী প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় - তার বিস্তারিত সমীক্ষণ উপস্থিত করেছেন। তাঁর কিছু ছোটগল্পেও এই পর্যালোচনা আছে। তবে ছোটগল্প যেহেতু তাঁর নিজের কথায় - 'সে নিটোল, সে সুডোল, ... সে সংক্ষিপ্ত, সে অনিবার্য' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৮ : ৩০১) ; ফলে তিনি দেশকালের বিস্তারিত প্রেক্ষাপটে এই সমীক্ষণকে উপস্থিত করেননি, মাত্র দুটি গল্প যেমন 'বদনাম' ও 'শেষ কথা'য় এর ইঙ্গিতগর্ভ ইশারা আছে মাত্র।

ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও লেখকগণ এক ধরনের একক সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শের ওপর নির্ভর করে জাতিরাষ্ট্র গঠনের কথা বলেছিলেন, যা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। অন্য আর একধরনের লেখক ছিলেন যারা শুধু ভারতীয়তার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত জাতিরাষ্ট্রের ধারণাকে অনুমোদন দেননি। তাঁরা বিশ্বজনীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন, বিশ্বসভ্যতার যা কিছু অবদান তার ওপর নির্ভর করে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন। এই ভাবুকগণ, কোনো সন্দেহ নেই, এনলাইটেমেন্ট-পরবর্তী পৃথিবীতে মানবতাবাদ, মানবকল্যাণ সম্পর্কে যে ধারার প্রসার ঘটে, সেই ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই দলভুক্ত একজন ভাবুক (নন্দী ১৯৯৪ : x)। পশ্চিমের সবকিছুই তাঁর কাছে বর্জনীয় বা পরিত্যাজ্য ছিল না। বরং তিনি পূর্ব ও

পশ্চিম — এই দুই বিশ্বকে তাঁর রচনায় মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন, যদিও পরিণামে পশ্চিমী ঔপনিবেশিক দেশগুলোর তুলনায় প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে (মাসুদুজ্জামান ১৯৯৫ : ৬১)। রবীন্দ্রাথের প্রবন্ধে এবং উপন্যাসে এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত সমীক্ষণ থাকলেও ছোটগল্পে তা প্রায় অনুপস্থিত। ইতিপূর্বে এই প্রবন্ধের অন্যত্র আলোচিত 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে ঔপনিবেশিক শাসক সম্পর্কে তাঁর ধারণা কেমন ছিল সেই পরিচয় আমরা জেনেছি।

'বদনাম' গল্পে পাওয়া গেল ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংগ্রামের ধরণটা কেমন হবে তার উল্লেখ। স্বদেশী আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে খুব প্রবলভাবে না হলেও সমর্থন দিয়েছেন, যদিও সন্ত্রাসবাদীদের ঘিরে তৈরি হওয়া ভক্তিগদগদ মনোভাব সম্পর্কে কৌতুক করতে ছাড়েননি। তবে এই গল্পের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে উপনিবেশমুক্ত ভারত সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ।

'শেষ কথা' গল্পে শুধু সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দিয়ে যে উপনিবেশমুক্ত ভারত সৃষ্টি করা যাবে না, সেকথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টির এই পদ্ধতি সম্পর্কেই ছিল তাঁর অনাগ্রহ। এই গল্পে নবীনমাধব কেন এই প্রক্রিয়ায় ঔপনিবেশিক শক্তিকে হঠানো যাবে না তার উল্লেখ করেছে :

> আমি বাংলাদেশের বিপ্লবীদলের একজন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহাকর্ষশক্তি আন্ডামান তীরের খুব কাছাকাছি টান মেরেছিল। নানা বাঁকা পথে সিআইডি-র ফাঁস এড়িয়ে এড়িয়ে গিয়েছিলুম আফগানিস্তান পর্যন্ত। অবশেষে পৌঁছেছি আমেরিকায় খালাসির কাজ নিয়ে। পূর্ববঙ্গীয় জেদ ছিল মজ্জায়, একদিনও ভুলি নি যে, ভারতবর্ষের হাতপায়ের শিকলে উখো ঘষতে হবে দিনরাত যতদিন বেঁচে থাকি। কিন্তু বিদেশে কিছুদিন থাকতেই একটা কথা নিশ্চিত বুঝেছিলুম, আমরা যে প্রণালীতে বিপ্লবের পালা শুরু করেছিলুম, সে যেন আতশবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো, তাতে নিজের পোড়াকপাল পুড়িয়েছি অনেকবার, দাগ পড়ে নি ব্রিটিশ রাজতক্তে। আগুনের উপর পতঙ্গের অন্ধ আসক্তি। যখন সদর্পে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলুম তখন বুঝতে পারি নি, সেটাতে ইতিহাসের যজ্ঞানল জ্বালানো হচ্ছে না, জ্বালাচ্ছি নিজেদের খুব ছোটে ছোটো চিতানল। ইতিমধ্যে য়ুরোপীয় মহাসমরের ভীষণ প্রলয়রূপ তার অতি বিপুল আয়োজন সমেত চোখের সামনে দেখা দিয়েছিল। এই যুগান্তরসাধিনী সর্বনাশাকে আমাদের খোড়ো ঘরের চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিষ্ঠা করতে পারব সে দুরাশা মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল ; সমারোহ

> করে আত্মহত্যা করবার মতোও আয়োজন ঘরে নেই; তখন ঠিক করলুম, ন্যাশনাল দুর্গের গোড়া পাকা করতে হবে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম, বাঁচতে যদি চাই আদিম যুগের হাত দুখানায় যে কটা নখ আছে তা দিয়ে লড়াই করা চলবে না। এ যুগের যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের দিতে হবে পাল্লা ; ... দীক্ষা দিলুম যন্ত্রবিদ্যায়। (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৮ : ২৫৫–২৫৬)

উল্লিখিত আত্মকথন থেকে বোঝা যায়, উপনিবেশ–বিরোধী সংগ্রামের সন্ত্রাসবাদী ধারাকে অনুমোদন করেননি রবীন্দ্রনাথ। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হতে গেলে প্রয়োজন কলাকৌশলের দিক থেকে, বিশেষ করে রণনীতি ও রণরীতি সম্পর্কে সমকক্ষতা অর্জন করা ; আর তা সম্ভব, রবীন্দ্রনাথের মতে যন্ত্রপ্রযুক্তির মাধ্যমে। তিনি লক্ষ করেছেন, ঔপনিবেশিক শাসকরা প্রাচ্যের দেশগুলোতে মানবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের যে বিপুল সম্ভার রয়েছে, সে–সবের আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেনি, শুধু চাষীকে শোষণ করেছে :

> ইংরেজ অকেজো, তার প্রমাণ হয়েছে ভারতবর্ষে — একদিন হাত লাগিয়েছিল তারা নীলের চাষে আর একদিন চায়ের চাষে—সিবিলিয়ানের দল দপ্তরখানায় তকমাপরা 'ল অ্যান্ড অর্ডর'–এর ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু ভারতের বিশাল অন্তর্ভাণ্ডারের সম্পদ উদ্ঘাটিত করতে পারে নি, কী মানবচিত্তের কী প্রকৃতির। ব'সে ব'সে পাটের চাষীর রক্ত নিংড়েছে ।(রবীন্দ্রনাথ ১৩৯৮ : ২৫৬)।

জাতিরাষ্ট্র গঠনের পর্বে ভারতীয় ভাবুকরা পৃথিবীর অন্যান্য উপনিবেশের অধীন লেখকদের মতো নিজেদের ভূখণ্ডকে 'মাতৃমূর্তি' কল্পনা করে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমের বোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন (বোহেমার ১৯৯৫ : ৮০), অন্যদিকে উপনিবেশবাদী শক্তিকে ভাবা হয়েছে 'পুরুষমূর্তি' রূপে। ঔপনিবেশিক লেখকরাও এরকমই ভেবেছেন। এই ভাবনার পেছনে ছিল সেই আধিপত্যবাদী ধারণা—নারীর তুলনায় পুরুষ যেমন বেশি শক্তিশালী, তেমনি উপনিবেশের অধীন রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রগুলোকে বেশি শক্তিশালী ভাবা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও দেশ বলতে মাতৃভাবমূর্তির কথা কল্পনায় এনেছেন, কিন্তু তা তার শান্ত–সৌম্য রূপের জন্যে, ভক্তিগদগদ–চিত্তের ভাবালুতা দিয়ে নিজের দেশকে তিনি উপনিবেশবাদী বর্বর শাসকদের অধীন করতে চাননি। ভারতীয় সমাজের বাস্তব পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে তিনি জাতীয় বুর্জোয়াদের উত্থান কামনা করেছেন, 'কাজে'র মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের জাগরণ প্রত্যাশা করেছেন। 'শেষ কথা' গল্পের নায়ক তাই বলেছে :

> জামসেদ টাটাকে সেলাম করেছি সমুদ্রের ওপার থেকে। ঠিক করেছি আমার কাজ পটকা ছোঁড়া নয়, সিঁধ কাটতে যাব পাতালপুরীর পাথরের প্রাচীরে। মায়ের আঁচলধরা বুড়ো খোকাদের দলে মিশে 'মা মা' ধ্বনিতে মন্তর পড়ব না, আর দেশের দরিদ্রকে অক্ষম অভুক্ত অশিক্ষিত দরিদ্র বলেই মানব, 'দারিদ্রনারায়ণ' বুলি দিয়ে তার নামে মন্তর বানাব না। প্রথম বয়সে একরকম বচনের পুতুলগড়া খেলা অনেক খেলেছি,— কবিদের কুমোর বাড়িতে স্বদেশের যে রাংতা -লাগানো প্রতিমা গড়া হয়, তারই সামনে বসে বসে অনেক চোখের জল ফেলেছি। কিন্তু আর নয়, এই জাগ্রতবুদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনেই শুকনো চোখে কোমর বেঁধে কাজ করতে শিখেছি। এবার গিয়ে বেরিয়ে পড়বে এই বিজ্ঞানী বাঙাল কোদাল নিয়ে কুড়ুল নিয়ে হাতুড়ি নিয়ে এদেশের গুপ্তধনের তল্লাসে, এই কাজটাকে কবির গদগদকণ্ঠের চেলারা দেশমাতৃকার পূজা বলে চিনতেই পারবে না। (রবীন্দ্রাথ ১৩৯৮ : ২৫৬)

রবীন্দ্রনাথ যদিও ইউরোপীয় আদলে জাতিরাষ্ট্র গঠনে উৎসাহী ছিলেন না, তবু স্বদেশের ভবিষ্যৎ রূপ নির্মাণে তিনি যে বিশেষ এক ধরনের পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, 'শেষ কথা'র উপর্যুক্ত অংশে তা অনুক্ত থাকেনি। রবীন্দ্রনাথের উপনিবেশ-বিরোধী ভাবনা আসলে এভাবেই পূর্ণতা পেয়েছে। উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামে গ্রামশি বলেছেন পর্বে পর্বে নানা রীতিপদ্ধতি অবলম্বনের কথা। রবীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁর ছোটগল্পগুলোতে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর নির্মম শাসন-শোষণ, স্বদেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশা, দীনতা-অক্ষমতা, সামর্থ্য-সংগ্রাম - সব কিছুই উপজীব্য করেছেন।সহজ সরল পথে ঔপনিবেশিক শাসকের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, এরকম ভাবেননি। ঔপনিবেশিক শাসনের কালে তা ভাবা সম্ভবও ছিল না। তবু এর প্রভাববলয় থেকে একদিন না একদিন মুক্তি পেতে হবে— একথা জানাতে ভোলেননি তিনি। মুক্তি অর্জনের সেই পথটি কী হতে পারে—উপনিবেশের অধীন ভাবুকদের একজন হিসেবে ছোটগল্পের আঙ্গিকগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তারই ছবি তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন গল্পে। মুখোমুখি হয়েছেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির এবং ঔপনিবেশিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছেন নিজস্ব ডিসকোর্স। রবীন্দ্রনাথের বেশকিছু ছোটগল্পে আমরা পাই ঔপনিবেশিক পরিবেশ-প্রতিরোধের সেই দ্বান্দ্বিক ছবি — যা তৎকালীন ঔপনিবেশিক পরিবেশ, আধিপত্য, ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের জটিল রূপটিকে আমাদের কাছে বেশ স্পষ্ট করে তোলে। ভারতীয় ও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বা তাদের সৃষ্ট স্থানীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে কী রকম মিথষ্ক্রিয়া ঘটেছিল, কী রকম সংঘাত-সমন্বয়ের সৃষ্টি

হয়েছিল, ব্যক্তি-মানুষের রূপ কেমন দাঁড়িয়েছিল — তার ছবিও এসব গল্পে চমৎকারভাবে উপজীব্য হয়েছে। রবীন্দ্রগল্পের সার্থকতা মূলত এখানেই, বাংলা ছোটগল্পের ধারায় তাঁর স্থান একারণেই নিঃসন্দেহে অনন্য হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র

আনোয়ার পাশা (১৩৭০), *রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা,* ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ।

মাসুদুজ্জামান (১৯৯৭) 'রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে প্রতীচ্য সভ্যতা', *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা* (সম্পাদক: অচিন্ত্য বিশ্বাস), ১৯৯৫-৯৫, সপ্তম সংখ্যা, কলিকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

—(১৯৯৫), 'প্রাচ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও রবীন্দ্রনাথ', *একুশের স্মারকগ্রন্থ ৯৫*, (সম্পাদক, শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য). ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

— (১৯৯৮), 'রবীন্দ্রসাহিত্যে আত্মস্বরূপ', প্রবন্ধটি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য গৃহীত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯৫), *রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী।

— (১৩৯৫ক) *রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী।

— (১৩৯৫খ) *রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী।

— (১৩৯৬) *রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী।

— (১৩৯৬ক) *রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী।

— (১৩৯৭) *রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী।

— (১৩৯৭ক) *রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী।

— (১৩৯৮) *রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী।

— (১৩৯৮ক) *রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী।

Ahmad, A. (1992), *In Theory: Classes, Nations, Literaures*, London : Verso.

Ashcroft,B. et al (1989), *The Empire Writes Back*, London: Routledge.

Barry, P (1995), *Beginning Theory, Manchester:* Manchester University Press.

Bhaba, H (1994), *The Location of Culture*, London: Routledge.

Boehmer E (1995) Colonical and Postcolonial Literature, Oxford,

Oxford University Press.

Breckenridge, C. and van der Veer, P. (eds). (1993), *Orientalism and the Postcolonical Predicament*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Chatterjee, P. (1986), *Nationalist Thought and the Colonial World*, London: zed Press.

-- (1994), *The Nation and ilts Fragments: Colonial and Post-Colonial Histories*, Delhi: Oxford University Press.

Eagleton, T. et al, *Nationalism, Colonialism and Literature*, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Fanon, F. (1971) , *The Wretchd of the Earth*, Harmondsworth: Penguin.

-- (1989), *Studies in a Dying Colonisalism*, London: Earthscan Publications Limited.

Foucault, M. (1991), *Discipline and Punish*, London: Penguin Books.

Gramsci, A. (1971), *Selections From the Prison Notebooks* (translated by Q. Hoare and G. Nowell Smith), New York : International Publishers.

Inden, R. (1990), *Imaging India*, Massachusetts: Blackwell.

Nandy, A. (1983), *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self Under Colonisalism*, Delhi: Oxford University Press.

-- (1994), *The Illegitamacy of Nationalism*, Delhi: Oxford University Press.

Pafford, M. (1989), *Kipling's Indian Fiction*, Hampshire: Macmillan.

Parker, M. and Starkey, R.(eds). (1995), *Postcolonial Literatures*, Hampshire: Macmilan.

Rettansi, A. (1997), 'Postcolonialism and its discontents', *Economy and Society, Volume 26 Number 4*, London: Routledge.

Said. E. (1978), *Orientatlism*, London: Routledge.

-- (1993), *Culture and Imperialism*, London: Chatto & Windus.

Spivak, G. (1987), *In Other Worlds*, London: Methuen.

-- (1993b), *Outside in the Teaching Machine*, London: Routledge.

Suleri, S. (1992), *The Rhetoric of English India*, Chicago: The University of Chicago Press.

Thiongo, N. (1981), *Decolonising the Mind*, London: James Curry.

Thomas, N. (1994), *Colonialism's Culture*, Cambridge: Polity Press.

Trotter, D. (1990), 'Colonial Subjects', *Critical Quarterly, volume 32, number 3.*

Viswanathan, G. (1989), *Masks of Conquest*, London: Faber.